দুলিয়া



লীলা মজুমদার

দুলিয়া

লীলা মজুমদার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৪
নভেম্বর ১৯৭৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র ১৩৮৮
মার্চ ১৯৮২
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া রোড
কলকাতা ২৯
অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদপট
শুভ সোম
মুদ্রক
প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ছয় টাকা

উৎসর্গ

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্যামলদা,

এই বইখানি তোমাকে দিলাম। আশীর্বাদ কর যেন তরুণ পাঠক-পাঠিকারা তোমার সরসতা, উদারতা, ভয়শূন্যতা লাভ করে। ইতি গুণমুগ্ধা—

নীলা

দুলিয়া

দইওয়ালাতে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। সে কি ভোর! সচরাচর অমন দেখা যায় না। দূরে যেখানে আকাশেতে মাটিতে মিশে গেছে, সেখানে জলের রেখার মতো চিকচিকে একটি সাদা রেখা। খুব সকালে যারা ওঠে, তারা ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরাচ্ছে, স্যাঁতসেঁতে কাঠ জ্বালাচ্ছে। সে ধোঁয়া আকাশে না উঠে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছে। ধরা-মা'র গরম কাঁথা নরম গার আরাম ছেড়ে নড়তে চাইছে না। খড়ের চালগুলোও ঝুলে পড়ে মাটি থেকে বেশি দূরে নেই। গাছপালাও কুয়াশা মেখে মেঘের ডেলা হয়ে আছে। বন্ধ দরজা-জানলার পেছনে আশী বছরের বুড়ো ঠাকুরদাদের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত আকাশ যেন মিহি সাদা মেঘের ওড়না জড়িয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে নীল রংটি বড় কোমল হয়ে দেখা দিচ্ছে। চারদিক থেকে গোরু মহিষের ডাক শোনা যাচ্ছে। মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে; সারাজীবন যা খুঁজেছি কিন্তু পাইনি, সে কি তবে এইখানে?

আপাদমস্তক রঙ-বেরঙের তালি দিয়ে তৈরি করা মোটা কাঁথা জড়িয়ে, মাথার ওপর তিনটি ঝকঝকে পেতলের হাঁড়ি বসিয়ে, একজন সত্তর বছরের বুড়ি গাড়িতে উঠল। তার পেছন পেছন একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েও পাহাড়ে নদীর মতো কলকল করতে করতে উঠে পড়ল। নিজের পাশে হাঁড়ি নামিয়ে বেঞ্চির ওপর বুড়ি বসল। সবচেয়ে নিচে বড় হাঁড়ি, তার মুখে বসানো মাঝারি হাঁড়ি, সবার ওপরে সব-চেয়ে ছোট হাঁড়ি। ঘন দুধে ভরা হাঁড়ির মুখে এক মুঠো সোনালী খড় ভাসছে। ঘরময় কি একটা মিষ্টি গন্ধ, ফুলের গন্ধ ফলের গন্ধ মহুয়ার

গন্ধ মধুর গন্ধ, সব ভালো গন্ধের পরম সুগন্ধ হয়ে ভুরভুর করতে লাগল।

ছেলেমেয়েগুলো বুড়ির হাঁটুর চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসল, কেউ বা মাটিতে, কেউ বা বেঞ্চির কিনারে, কেউ হাঁটু গেড়ে, আবার কেউ রইল দাঁড়িয়ে। কালো চুলে তাদের তেল পড়েনি চিরুনি পড়েনি, কালো চোখের চারধারে কাজলের কালোর বদলে একটু লালচে আভাস, যেন এইমাত্র চোখ রগড়ে ঘুম থেকে উঠে বসেছে। হাত-পাগুলো তাদের কেবলি নড়েচড়ে, এই খোলে এই বন্ধ হয়।

তারা সবাই মিলে বুড়ির কোলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "কার জন্য এত দুধ নিয়ে যাচ্ছ তুমি ? আমাদের একটু দেবে না ?"

বুড়ির কোটরে বসা চকচকে চোখের কোণায় বয়সের ইকড়ি-বিকড়ি দাগ পড়েছে, কতক দাঁত আছে, কতক নেই। বুড়ির মুখ হাসিতে ছলছলিয়ে উঠল, "ওরে ও দুধে নজর দিস নে, ও দুধ যে আমার দাদামশাই খাবে।"

তারা বললে, "তা কেন ? অত দুধ তোমার দাদামশাই খাবে কেন ?"

বুড়ি বললে, "ওমা, তা খাবে না ? যখন ছোট ছিলাম, দাদামশায়ের কাছে মা আমাকে জিম্মা করে দিয়ে কাজে যেত আর আমি অমনি এই আতাগাছের মগডালে চড়ি, এই পুকুরপারে দৌড় দিই। দাদামশায় হাঁচড়-পাঁচড় করে পেছন পেছন ছোটে, এই আমাকে ধরে ফেলে বলে, অমনি আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে, ছু-উ-উ বলে কানে তালা লাগিয়ে ছুট্—ছুট্—ছুট্। হাঁপিয়ে হদ্দ হয়ে যেত বুড়ো, হাত জোড় করে বলত, লক্ষ্মী দিদি তোর পায়ে পড়ি, একটুখানি থির হয়ে বস্, আমি তোকে বাঁশি শোনাই। অমনি আমিও ভালোমানুষের মতো তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

তখন পিরানের ভেতর থেকে দাদামশায় বাঁশের বাঁশি বের করে, তার গায়ে হাত বুলোত, ধুতির খুঁট দিয়ে ঘষত মুছত, তারপর মুখে তুলত। অমনি বুড়োর কাশি থেমে যেত, হাঁপানি সেরে যেত, সে কি

সুর রে, তোদের কাছে আর কি করে বলি। শুনতে শুনতে প্রাণটা আমার কানায় কানায় ভরে যেত; বাজাতে বাজাতে দাদামশায়ের গলা শুকিয়ে যেত; তার হাঁটুতে মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টের পেতাম না। শুকনো গলাটা ভেজাবার জন্য তখন তাকে দুধ দিইনি, জল দিইনি; তাই দাদামশায়ের জন্য আজ কলসি ভরে দুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, "আমরা তোমার সেই দাদামশাই; কই, দাও, আমাদের মুখে দুধ দাও।" বলে, বুড়ির কোলে থুতনি রেখে, ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়িও ছোট ঘড়ার সব দুধটুকু তাদের গালে একটু একটু করে ঢেলে দিয়ে, পা গুটিয়ে বাবু হয়ে বসল।

তখন ছেলেমেয়েগুলো উঠে পড়ে রুক্ষ-রুক্ষ চুলগুলোকে ঝেড়ে, মাঝের ঘড়াটাকে দেখিয়ে বলল, "ও হাঁড়ির দুধ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ? ও দুধটি আমাদের দাও।"

বুড়ি বললে, "তা কি করে হয়? ও দুধ তো আমার বাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

তারা অবাক হয়ে বললে, "কেন, বাবার জন্য অত দুধ কেন?"

বুড়ি বললে, "ও মা, ওটুকুও নেব না? গ্রীষ্মকালে খরা লাগলে আমাদের গাঁয়ে একফোঁটা জল পাওয়া যেত না। পুকুর শুকিয়ে তলায় ফাটল ধরত। কুয়ো শুকিয়ে কাদা উঠত, সেই কাদা চুষে জন্তু-জানোয়ার খোঁড়া মানুষ বাঁচত। আমার মা-বাবা আমাকে নিয়ে দু কোশ হেঁটে ঝরনার জল আনত।

যাবার সময় জলের লোভে দৌড়ে দৌড়ে আগে আগে যেতাম। তখন ভোর-ভোর, মাথার ওপর সূয্যির তেজ নেই, মনের খুশিতে চলে যেতাম। সেখানে পাথরের গা বেয়ে সাদা ফেনায় ভরা জল নামত, আমরা আশ মিটিয়ে জল খেতাম, গায়ে মাথায় জল ঢালতাম। তারপর এই রকম জলভরা কলসির মুখে কলসি বসিয়ে মা মাথায় তুলে নিত। বাবা ভিজে গামছা মাথায় চাপিয়ে, মশক ভরে জল নিত। ফেরার

পথে আমি খালি খালি পেছিয়ে পড়তাম। ক্রমে মাথার ওপর সূয্যির তেজ বাড়ত, কোথাও ছায়া নেই, মেঘ নেই; চোখে অন্ধকার দেখতাম, হাঁটু মুড়ে পড়ে যেতাম।

বাবা তখন ভিজে গামছা দিয়ে, আমার মুখ চোখ মুছিয়ে, আমার মাথায় গামছাটা জড়িয়ে দিয়ে, আমাকে কাঁধে চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে আসত। শুনতে পেতাম হাপরের মতো বাবার বুক উঠছে পড়ছে, খ্যাস খ্যাস করে বাবার নিশ্বাস পড়ছে। তখন তো বাবাকে জল দিইনি, দুধ দিইনি, তাই আজ বাবার জন্য ঘড়া ভরা দুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, বুড়ির হাঁটুতে থুতনি রেখে বললে, "আমরা তোমার সেই বাবা। দাও, আমাদের মুখে দুধ দাও।" এই বলে ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়ি তখন মাঝারি ঘড়া থেকে তাদের মুখে বেশি বেশি করে দুধ ঢেলে, ঘড়া খালি করে নামিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসল।

তখন ছেলেমেয়েরা সবার নিচের সবচেয়ে বড় ঘড়া দেখিয়ে বলল, "ও দুধ তুমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ, ও দুধ আমাদের দাও।"

বুড়ি বললে, "তা কি করে দিই? ও দুধ যে আমার স্বামীর, আমার দেওরদের আর ছেলেদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ও দুধ তোদের কি করে দিই?"

তারা বললে, "কেন, ওদের জন্য অত দুধ নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

বুড়ি ফোকলা দাঁত বের করে বলল, "তা নেব না? আমাদের খেতের ফসল কারা ফলিয়েছে? কারা গাই বলদ চরিয়েছে? রাতে কারা মশাল জ্বেলে ভালুক তাড়িয়ে মৌচাক বাঁচিয়েছে? দিন নেই, রাত নেই, খিদে নেই, তেষ্টা নেই, খাল কেটে বাঁধ দিয়ে জল আনত তারা। দুপুরবেলা চারটি খেয়ে আবার গিয়ে লাঙল ধরত, মাঠে মাঠে গরু আগলাত। অজন্মার বছর আমাদের খোকাখুকুদের মুখে এক মুঠো গম দেবার জন্য প্রাণে শুকিয়ে মরত তারা। তখন তো তাদের গাল ভরে দুধ দিতে পারিনি, তাই আজ তাদের জন্য ঘড়া ভরে দুধ নিয়েযাচ্ছি।"

ছেলেমেয়েগুলো অমনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বুড়ির কোলে থুতনি

রেখে, ছোট ছোট হাঁ করে বললে, "আমরা তোমার সেই স্বামী, সেই দেওর, সেই ছেলে, দাও আমাদের মুখে দুধ দাও।"

বুড়ি তখন তাদের গালে অনেকখানি করে দুধ ঢেলে, অর্ধেক কলসি খালি করে, নামিয়ে রাখল। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে ঘড়া দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও দুধ তবে কার জন্য রাখলে?"

বুড়ি ছলবলিয়ে হেসে বলল, "এটুকু আমার নাতি-নাতনীদের জন্য।"

তারা বলল, "কেন, তাদের জন্য কেন? তারা করেছেটা কি?"

বুড়ি বলল, "না দিয়ে করি কি? তারা যে খালি বলে দাও, আমাদের দাও, আমাদের মুখে দুধ ঢেলে দাও।"

ছেলেমেয়েগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, বুড়ির হাঁটুতে থুতনি রেখে বলল, "আমরাই তো তোমার নাতি-নাতনী, দাও, আমাদের দুধ দাও।" বলে ছোট ছোট হাঁ করলে। বুড়ি তখন চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে বাকি দুধটুকুর সবখানি তাদের গালে ঢেলে দিয়ে, উঠে পড়ল। গাড়িও ঠিক সেই সময় দুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেল আর তারা সবাই কলকল করতে করতে, শূন্য কলসিতে চাপড় দিয়ে বাজাতে বাজাতে, বুড়ির সঙ্গে নেমে গেল।

শব্দ

ডায়মণ্ড হারবার ছাড়িয়ে কিছু দূর গেলে যে চিংড়িখালি বলে একটা জায়গায় পৌঁছানো যায়, এ-কথা অনেকেই জানে না। অথচ দুশো বছর আগে ঐ জায়গার নামে এ অঞ্চলের লোকে ভয়ে কাঁপত, কারণ ঐখানে ছিল কুখ্যাত বোম্বেটেদের একটা বড় আস্তানা। এখনো মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মড়ার খুলি কিংবা রুপোর বাসন বের করে চাষীরা আঁতকে ওঠে।

আমি অবিশ্যি এ-সব নিজে দেখিনি ; আমার পিসতুতো ভাই সাবুর দাতুর বাড়ি ওখানে, আমার সঙ্গে চিংড়িখালির এইটুকুই সম্বন্ধ। সেবার পুজোর ছুটিতে গেছিলাম ওখানে। গ্রাম বলতে বিশেষ কিছু নেই, খান-তুই পুরনো পাকা বাড়ি, খানকতক টিনের চালের ঘর, একটা প্রাইমারি স্কুল, একটা পর্তুগিজ গির্জা, কাছেই নদীর ধারে জেলেদের গ্রাম, কয়েকটা দোকান, একটা কালী-মন্দির। সেখানে বোম্বেটেরা ফিরিঙ্গি কালীর পুজো দিত, জেলেরা এখনো দেয়। মন্দিরের চাবি থাকে গির্জার পাদ্রীর কাছে। সাবুর দাতুদের কুলপুরোহিত রোজ তুবেলা পুজো দিয়ে আসেন। বেশ রোমাঞ্চকর জায়গাটা।

গঙ্গা ওখানে তু'মাইল চওড়া, ওপার দেখা যায় না। জোয়ারের সময় মনে হয় বুঝি গোটা বঙ্গোপসাগর নদীর মুখে ঢুকে পড়ছে। হাওয়া দিলে অদ্ভুত গুপ-গুপ শব্দ হয়। হাঙরের ভয়ে কেউ জলে নেমে স্নান করে না। আমি নিজেই কতবার দেখেছি হাঙরদের তেকোণা পাখনা জলের ওপর ভেসে রয়েছে।

নদীর তীর ধরে আরেকটু দক্ষিণে গেলে মনে হয় বুঝি কোনো জনমানবশূন্য সাগরের দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। সেখানে উঁচু পাড়ি, বসতির চিহ্ন নেই ; চাষ হয় না, মাটি বড় নোনা। সন্ধ্যাবেলায় সাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওখানে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। নদীটা সেখানে একটা বাঁক নিয়েছে, স্রোতের সে কি বেগ! পাড়িটা পাথুরে, তার ওপর ছলাৎ ছলাৎ করে জল আছড়ে পড়ছে, তারপর ফেনা ছিটিয়ে কলকল করে ছুটে যাচ্ছে।

ডুবন্ত সূর্যের আলোতে হঠাৎ মনে হল নদীর ঢেউয়ের বুকে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই মাথা তুলে রয়েছে, তারই মধ্যে যেন একটা কালো পাথরের প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। সেটা চারপাশের সঙ্গে এমনি মিলিয়ে আছে যে হঠাৎ ঠাওর হয় না। ঠিক প্রাসাদ হয়তো নয়, তবে চারদিকে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা একটা কেল্লা বটে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে জলের শব্দ ঠিক কানে আসছিল না, শুধু একটা মিহি গুম-গুম ক্যাও-ক্যাও মনে হচ্ছিল।

সাবু বলল, "অত অবাক হবার কি আছে? ঐ তো বোম্বেটেদের কেল্লা। উত্তরাধিকারসূত্রে দাদুদের ওটা পাওয়া উচিত। আমরা বোম্বেটেদের বংশধর।"

"কে থাকে ওখানে? একটা আলো জ্বলে উঠল যে?"

"থাকে এক পাগলা প্রফেসার। গোপনে গবেষণা করে। আর থাকে তার অ্যাসিস্টেন্ট। ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোকেরা ওদিক মাড়ায় না। চল, জায়গাটা সত্যি ভালো না! এত দূর এসেছি জানলে দাদু রেগে যাবেন। এখানকার লোকেরা নাকি অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে—ও কি!"

খ্যা—খ্যা—খ্যা—খ্যা করে কে জানি বিকট হেসে উঠল। দেখি লালচে মুখ, রোগা লম্বা একটা লোক, তার খাড়া খাড়া কাঁচা-পাকা চুল, পরনে জাহাজের সারেঙদের মতো ঢিলে নীল কুর্তা পাজামা, কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সাবু আমার সার্ট ধরে টেনে বলল, "বাড়ি চল।"

লোকটা বলল, "সে কি, মজা না দেখেই চলে যাবেন? ঐ যে পাগলা প্রফেসার যন্ত্রপাতি সওদা করে ফিরছেন, দেখে যাবেন না? কেউ ওঁকে দেখতে পায় না।"

আমি বললাম, "কিসের যন্ত্রপাতি? কি হয় ওখানে?"

লোকটা উঠে পড়ে বলল, "কি জানি, মুখ্যু মানুষ। শুনেছি শব্দ ধরার যন্ত্র।" এই বলে টুপ করে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম দূরে একটা কালো নৌকো খোলামকুচির মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। চারদিক থমথম করছে। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি ফিরলাম।

জায়গাটা গল্পের বইয়ের জায়গার মতো। রাতে সমুদ্রের কচ্ছপের মাংস হয়েছিল। মাখনের মতো নরম। ওখানকার হাটে প্রকাণ্ড গুগলী বিক্রি হয়। অদ্ভুত চেহারার মাছ কেনে লোকে। এক রকম মাছের আবার মাথার একই পাশে দুটো চোখ, অন্য পাশটা চাঁচা-পোঁছা। পাথরের ফাটল থেকে জেলেদের ছেলেরা এই বড় বড় নীল চিংড়ি,

কালো কাঁকড়া টেনে বের বরে, বিক্রি করতে আনে। রুই কাতলাকে ওরা বলে নিরামিষ।

সাবুর দাদু এ-সব কথা বলেছিলেন আমাদের। ওখানে ওঁদের চোদ্দ পুরুষের বাস। ও জায়গা সম্বন্ধে জানেন না এমন কিছু নেই। দুঃখের বিষয়, বোম্বেটের কেল্লা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না, কারণ ওদিকে আমাদের যাবার কথা নয়।

কিন্তু জায়গাটা আমাদের চুম্বকের মতো টানত। রোজ যাওয়া ধরলাম। ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল। পাড়ির ওপরের পথে না থেকে, পাথরের খাঁজে পা রেখে একটু একটু করে নিচের দিকে নামা ধরলাম। যতই নামি ততই কেল্লাটাকে স্পষ্ট করে দেখা যেতে লাগল। নিরেট পাথরে তৈরি, চারদিকে দোতলার সমান উঁচু দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের গুলি করত। পাঁচিলের গায়ে লোহার দরজা। বাইরে গভীর খাল কাটা। এক দিক দিয়ে তার মধ্যে নদীর জল হুড় হুড় করে ঢুকছে, আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পার হবার জন্য পুল আছে, সেটাকে লোহার শেকল দিয়ে টেনে কপিকলের সাহায্যে তুলে রাখা হয়েছে। সামনের দিকটাতে নদী। ব্যস্, কেল্লাটি যেন উদ্দাম জল-বেষ্টিত একটা দ্বীপ। দেখলে গা শিরশির করে।

নামতে নামতে সাত দিনের দিন কেল্লার পাথরের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। পাথরের খাঁজে অদ্ভুত পাখির বাসা দেখলাম। তারা আমাদের দেখে, মহা ক্যাঁও ক্যাঁও লাগাল।

পায়ের নিচে পাথর বড় পিছল। সামনে উত্তাল জলের স্রোত। বুক ঢিপঢিপ করছিল। সন্ধ্যা হয়েছে, এখন ফেরা উচিত। ফিরতে যাব, এমন সময় পেছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দুটো লোক আমাদের কনুই চেপে, হাতদুটোকে পেছনে পাছ-মোড়া করে ধরল। আমি আঁ আঁ করে যাই আর কি! সাবু বলল, "কি! কি! আমরা তো শুধু দেখছি, কোনো অনিষ্ট করছি না। ভালো করে দেখতেও পাচ্ছি না।"

বেঁটে জন কাষ্ঠ হেসে বলল, "সেই ভালো গোমেজ, ভেতরে এনে ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যাক।"

গোমেজ বলল, "শুনিয়ে দেওয়া যাক, বলুন। কি খোকারা, বলিনি স্যার শব্দ ধরেন ?"

এই তবে সেই পাগল বৈজ্ঞানিক। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ গোমেজ! যার তার কাছে আমাদের গোপন গবেষণার কথা বলে বেড়াও কেন বল তো ? সে যাক গে, সে আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম। আজ আমার মন বড় ভালো। এত দিনের চেষ্টা সফল হবার মুখে! ভালোই হয়েছে তোমরা এসেছ। তোমরা বড় ভাগ্যবান, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদানের নমুনা সবার আগে তোমরা শুনতে পাবে! ও কি, চোখ পিটপিট করছ কেন, গোমেজ, নিয়ে চল।"

"চোখ বাঁধব, স্যার ?"

"আরে না না, আর গোপনীয়তার দরকার নেই। চল।"

দেখলাম হাঙর ভরা পরিখার তলায় গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। তাই দিয়ে ঢুকে আমরা কেল্লার হলঘরে উঠলাম। অদ্ভুত জায়গা। পাথরে তৈরি, মনে হল কামান দাগলেও টসকাবে না। সেখান থেকে যে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসাল, সেটা একটা আধুনিক গবেষণাগার ছাড়া আর কিছু নয়। রেডিও, রেকর্ডার, গ্রামোফোনের মতো সব যন্ত্রপাতি। তাকের ওপর বড় বড় সমুদ্রের শাঁখ, বাজনা-বাদ্যি, বাঁশি, খোল, করতাল।

পাগল বৈজ্ঞানিক বললেন, "অবাক হবার কিছু নেই। শব্দ নিয়ে গবেষণা করি, শব্দ তৈরির জিনিস থাকবে না ? এ আর কি দেখছ ? কত মোরগ, ছ্যাতারে, বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, উল্লুক, কোলাব্যাঙ ইত্যাদি আছে আমার সাউণ্ড-প্রুফ ঘরে। নইলে ক্ষেপে যাব। ওদের গলার স্বর, পাখার ঝাপটানি মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরে তরঙ্গায়িত হবে, ভাবলেও রোমাঞ্চ হয় না ? কি গোমেজ ?"

গোমেজ প্রফেসারের কোঁকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "শব্দ-

তরঙ্গের মূল কথা বুঝিয়ে না দিলে কিছুই ওদের বোধগম্য হবে না, স্যার !"

প্রফেসার বসে পড়লেন। দেখলাম মোটা, বেঁটে, কালো, লোমশ, খ্যাঁদা নাক, সাবুর দাদুর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। পায়ে রবারের চটি, বোধ হয় যাতে অনন্তকাল শব্দ না হয়।

প্রফেসার বললেন, "এটুকু নিশ্চয় জান যে শব্দ হলেই তরঙ্গ ওঠে ? মানে তরঙ্গ না উঠলে শব্দই হয় না ? সেই তরঙ্গগুলো যায় কোথায় ?"

আমরা বললাম, "থেমে যায়, স্যার, আর শোনা যায় না।"

প্রফেসার রেগে গেলেন। "থেমে যায় না হাতি ! এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা বেঁচে আছিস !"

গোমেজ বলল, "বুদ্ধি না স্যার, বিদ্যে।"

"তুমি থাম, গোমেজ, অকারণে তরঙ্গ তুলো না। তরঙ্গ থামে না। অনন্তকাল ধরে দূর থেকে দূরান্তরে মহাশূন্যে কেবল এগিয়ে চলতেই থাকে। কোনো শব্দ থেমে যায় না। সেই আদ্যিকালে একটা বিকট বিস্ফোরণের ফলে সূর্যের গা থেকে পৃথিবীর গ্যাস ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, তার শব্দও আজ পর্যন্ত মহাশূন্যের বুকে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তো চলেইছে। কিচ্ছু থামে না। ডাইনোসরসের ক্যাঁওম্যাও, ম্যাস্টোডনের গর্জন, মহা-গিরগিটির খচমচ, তেমন ব্যবস্থা করতে পারলে, আজও শোনা যেতে পারে।"

আমরা তো তাই শুনে হাঁ !

প্রফেসার লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, "আমি সে ব্যবস্থা করছি।"

আমরা আঁতকে উঠলাম। প্রফেসার বললেন, "গোমেজ, কান-ফুসফুস লাগাও !"

কোথা থেকে চারজোড়া ইয়ার-ফোন বের করে, গোমেজ নিজের ও আমাদের কানে লাগিয়ে দিল। প্রফেসার সুইচ টিপলেন। অমনি কানে আসতে লাগল অদ্ভুত সব শব্দ ! যেন দূরে কিছুতে গর্জন করছে, কাছে কিসের প্রচণ্ড হাঁসফাঁস, মাঝখানে কান ফাটানো চ্যাঁ-চ্যাঁ !

আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রফেসার ঝুঁকে পড়ে সুইচ বন্ধ করে বললেন, "আদিম মহাকায়দের দৈনন্দিন জীবনের কয়েক মিনিটের শব্দ



শুনলে। এবার যা শুনবে সেটা ওর কয়েক লক্ষ বছর পরের শব্দ। গোমেজ, তুই নম্বর দাও।"

অমনি মনে হল কলকল, ছলছল, হুড়হুড়, হড়হড় করে প্রবল জলরাশি কূল ছাপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে গব-গব গবাস্ করে বড়

বড় কি সব ডুবে যাচ্ছে। আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ফট্ করে প্রফেসার সুইচ বন্ধ করতেই ধড়ে প্রাণ এল।

প্রফেসার বললেন, "বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা আছে, এ হয়তো তারই শব্দ। এবার তিন নম্বর দাও, গোমেজ। এই জায়গাটাতে দশ হাজার বছর আগে কেমন শব্দ হত শুনুক এরা।"

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল সড়সড়, খরখর খুরখুর, খুটখুট, টকটক, কটকট, গুম গুম গুম, ধুপ ধুপ ধুপ— ! প্রফেসার সুইচ টিপতেই সব চুপ। প্রফেসার হেসে বললেন, "এখানকার আদি বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক শব্দ শুনলে। জলাভূমির গোসাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ, কুমীরের চলাফেরা আর সেই পটভূমিকায় আদিম মানবের ঢোল পেটা ও তাণ্ডব নৃত্য।"

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনেক রাত হয়েছে, গোমেজ তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমার ঢের কাজ বাকি। তানসেন ধরতে হবে; বেহুলার নূপুরের ঝমঝম। আচ্ছা, তাহলে এসো।"

আমাদের মুখে কথা নেই। গোমেজ টর্চ জ্বেলে দুজনকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বের করে, নদীর উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে হাঁটিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে দাদুর সামনে হাজির করল। "এই নিন, বড়বাবু, আগাগোড়া চোখে চোখে রেখেছি। কোনো অনিষ্ট করেনি। আচ্ছা চলি, স্যারের জন্য কচ্ছপের ডিমের অমলেট ভাজতে হবে।"

গোমেজ চলে গেলে, দাদু মুচকি হাসতে লাগলেন। একটুও বকলেন না। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল-বারের মতো গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, "প্রাগ্-ঐতিহাসিক শব্দ শুনে বুঝি পিলে চমকেছে? ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সেকালে ঐ ধরনের আওয়াজ হওয়াই স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে ঐ সমস্ত রোমাঞ্চকর শব্দ সবই এই সামান্য জিনিসটা দিয়ে তৈরি।"

এই বলে তাকের ওপর থেকে মাটির খোল বসানো একটা খেলনার একতারা আর তার বাঁশের ছড় নামিয়ে দেখালেন। আমাদের চক্ষু ছানাবড়া।

"কে শব্দ তৈরি করল, দাদু ?"

"কে আবার করবে, এই শর্মা ছাড়া ? কার অত মাথাব্যথা ভাই বল্ ? আমার মামা-বংশের শেষ উত্তরাধিকারীকে তো শব্দ-শব্দ করে ক্ষেপে যেতে দিতে পারি না। যেটুকু পারি শব্দ যোগাই। সারা বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়ায়, ছুটি পেলেই এখানে এসে গবেষণা করে, নিজের পয়সাকড়ি, সময় সব ঢালে, সে-সব তো আর ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া যা চালাক, শীগগিরই এক দিন প্রাগ্-ঐতিহাসিক না হোক, নিদেন ঐতিহাসিক শব্দ ঠিক ধরে ফেলবে। তার আগে যাতে নিরাশ হয়ে ছেড়ে না দেয়, সেটুকু দেখা তো আমার কর্তব্য। তাই যা পারি খোরাক যোগাই। গোমেজের সাহায্যে। শুনবি নাকি ?"

এই বলে একতারাটা তুলে নিয়ে কখনো ছড় টেনে, কখনো ঢাকের মতো পিটিয়ে, কখনো তারে চিমটি দিয়ে, কখনো খোলের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়ে, কখনো থাবলে, কখনো খামচে, কখনো খুঁটে, কখনো ঠুকে, কি শব্দ যে না বের করলেন তার ঠিক নেই। মনে হতে লাগল আদিম কালের কোনো জলাভূমির ধারে দাঁড়িয়ে অতিকায় সরীসৃপদের জীবনযাত্রার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যে যেখানে ছিলাম হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম ; আর দাঁড়াতে পারলাম না।

তারপর একতারাটাকে আবার তাকে তুলে, দাদু বললেন, "কিন্তু তোদের না ওদিকে যেতে মানা করেছিলাম ! শেষটা আমাকে ধরে ফেলে সব ফাঁস করে দিস আর কি ! গোমেজটার চোখ রাখার কথা ছিল, ব্যাটা করেটা কি ? অবিশ্যি যথেষ্ট হেল্পও করে। গবুর রেকর্ডারের সঙ্গে আমার গাছের ওপরের মাইক না হলে কে কনেক্ট করত শুনি ? তাছাড়া আমি যখন গাছে চড়ি, ও মই ধরে। এ-সব ঋণ শোধ করার নয়।"

আমি বললাম, "গবু কে, দাদু ?"

দাদু তো অবাক ! "সে কি, গবুকে জানিস না ? ঐ তো তোদের পাগলা বৈজ্ঞানিক, আমার মামাতো ভাই গবু। যা, খেয়েদেয়ে শো গে যা।"

হাঁস

পন্নুরা মেঠো ইঁদুর, সাপ, এই সব খেয়ে দেখেছে, নাকি বেজায় ভালো খেতে। ওদের গাঁয়ের সবাই নাকি খায়।—ঠামুরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করে, অথচ কেউ একবার চেখেও দেখেনি। ও-সব খাওয়াকে ঠামুরা ঘেন্না করে, এমন কি কাকুও। কিন্তু পন্নুর ঠাকুরদা বলেছে যারা চিংড়ি, কাঁকড়া, গুগলি খায়, তারা যেন কোনো কথা বলতে না আসে। যারা বুনো-হাঁস মারে তাদের কোনো কথা শুনতে হয় না।

পন্নুদের গ্রাম ফুলমণি। ফুলমণির পাশে মস্ত জলা। সেখানে প্রত্যেক বছর ঠিক যেই একটু একটু করে শীত পড়তে শুরু হয়, ধান পেকে বাতাস লাগলেই ঝম-ঝম করে বাজে, কিন্তু তখনো ধান কাটা শুরু হয় না, সেই সময় ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস উত্তর দিক থেকে উড়ে এসে জলার ধারে নামে। সারা শীতকাল ওরা ওখানে থাকে, আবার যেই দখনে বাতাস দিতে শুরু করে, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

পন্নুর বুড়ো ঠাকুরদার নাম হীরেমন। এক সময় নাকি সে হীরেমন পাখিদের মতো সুন্দর দেখতে ছিল। এখন চুলগুলো শণের নুড়ি, চোখ দুটো কোটরের মধ্যে থেকে মিটমিট করে তাকায়, শরীরটা এই এতটুকু একটা শুকনো পাকানো দড়ির মতো। কিন্তু এখনো সে তীর মেরে আকাশ থেকে উড়ন্ত শকুন নামায়। সে-ই বলে ফুলমণির লোকরা বুনো হাঁস মারে না। অনেক দিন আগে, হীরেমনের ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময়, অন্ধকার রাতে গা-ঢাকা দিয়ে শত্রুরা এসেছিল গাঁ জ্বালাতে, আর অমনি বুনো হাঁসরা এমনি ডানা ঝটপটি আর ক্যাঁক-ক্যাঁক ডাক শুরু করে দিল যে গ্রামের লোকরা জেগে গিয়ে তীর

ধনুক, লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। বাছাধনরা তখন পালাবার পথ পান না!

ঐ কথা মনে করে এখনো ১লা পৌষ ওদের গাঁয়ে উৎসব হয়। নাচ-গান হয়, শুওর মারা হয়। ঠামু নাক সিঁটকে সেই কথা বলতেই, নিমাই বলল, "ছোটদাদু তো গুগলি খায়।"

ঠামু চটে গেল। "গুগলি খাবে না তো হাঁপানি সারবে কি করে? পরমহংসদেব গুগলি খেতেন।" এর পর আর কথা চলে না।

নিমাই কাকুর ঘরে গেল। কাকু পাখি-মারা বন্দুক সাফ করছিল। ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, "কি রে, পাখি নামল নাকি? তোর বন্ধু মন্নু কি বলে?"

নিমাই বলল, "মন্নু না, পন্নু।"

কাকু বিরক্ত হয়ে উঠল, "ঐ একই কথা। জলার ধারেই তো ওদের গাঁ। ও বলতে পারবে না তো কে বলবে?"

নিমাই বলল, "না, নামেনি। এ বছর ওখানে পাখি নামবে না।"

শুনে কাকুর কি হাসি। "কেন৷ রে, নামবে না কেন? তোর বন্ধু মানা করেছে বুঝি? ওখানে ওদের গাঁ বসবার আগে থাকতেই বুনো হাঁসরা প্রত্যেক বছর, হিমালয়ের ওপার থেকে উড়ে এসে গরম দেশে শীত কাটায়। আর প্রত্যেক বছর শিকারীরা দলে দলে এসে খালে-বিলে-জলায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি মারে। এই রকমেই চলে আসছে।"

কাকু খুব খারাপ লোক নয়। বাঘা কুকুরটাকে আদর করে, স্নান করায়। এমন কি নেড়ি-কুত্তাদেরও খেতে দেয়। বলে, "ওরে, ওদের পেটে চোদ্দ পুরুষের খিদে জমে আছে, ওদের খেতে দিতে হয়।"

কাকুর নেয়ারের খাটে বসে পড়ে নিমাই বলল, "কেন হাঁস মার?"

কাকু তো অবাক! "বাঃ রে, হাঁস মারব না? ক্যায়সা খেতে, তাই বল্?"

নিমাই বলল, "মুরগিও তো ভালো খেতে। তাই খাও না কেন?"

কাকু সত্যি রেগে গেল। "বলি, দয়ার অবতার, বুনো হাঁস মারলে দোষ হয় আর মুরগি মারলে হয় না ?"

নিমাই কিছু ভেবে না পেয়ে বলল, "মুরগি তো মোটে দুটো-একটা মারা হয়। পাখি তোমরা হাজার হাজার মার।"

কাকু একটু ভেবে বলল, "হাজার হাজার নয় রে ব্যাটা, বড় জোর শত শত হতে পারে।" এই বলে উঠে পড়ে, ঠাম্মুকে ডেকে বলল, "মা, আমাদের আপিসের সেই জগাই-মাধাই কিন্তু পাখি নামার খবর পেলেই আসবে। খোয়া ক্ষীর বানিয়ে রাখছ তো ?"

ঠাম্মুও হাসতে লাগল। কাকু বলল, "নিমু কি বলছে জান ?"

নিমু আর দাঁড়াল না ; সোজা ফুলমণির দিকে চলল।

পন্নু জলায় ধামা চাপা দিয়ে মাছ ধরছিল। ওর বুড়ো ঠাকুরদা জলার ধারে কালো পাথরের উপর বসে ছিল। ওকে দেখেই ওরা উঠে এল। "কি হল ? নিমু দাদার মুখ হাঁড়ি কেন ?"

নিমু পন্নুর হাত থেকে ছোট্ট ধামাটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভিতর থেকে গুটি তিনেক মাছ বেরিয়ে পড়ে, ঘাসের উপর কিলবিল করতে লাগল।

পন্নু মাছগুলোকে আবার তুলে বলল, "দুপুরে রান্না হবে।"

নিমু বলল, "তোমরা হাঁস মার না, তবে মাছ মার কেন ?"

বুড়ো ঠাকুরদা ওকে কাছে ডাকল, "মাছ মারি খাবার জন্য, দাদা, শুধু শাক ভাত খেয়ে কি বাঁচা যায় ?"

নিমুকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, "এ বছরও বুঝি ছোট বাবুরা পাখি মারবে ?"

নিমু বলল, "ওদের এখানে আসতে দাও কেন তোমরা ? এই জলাটা তোমাদের না ?"

বুড়ো ঠাকুরদা বলল, "না গো দাদা, ঐ খেজুর গাছের সারি পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ের এলাকা। জলাটা তোমার ঠাকুরদার জমির মধ্যে পড়ে।" নিমুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে পন্নু বলল, "আমাদের পরব আসছে গো। এক মাস ধরে মেলা বসবে।

মোড়ল বলছিল পঞ্চাশটা টাকা তুলতে পারলে সুখতলার বাজনদারদের আনাত। দিন-রাত তারা দিমি-দিমি বাজনা বাজাত। কিন্তু পয়সা-কড়ি যোগাড় হচ্ছে না।”

বুড়ো ঠাকুরদা জলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। “কি দেখছ?” ঠাকুরদা বলল, “গান বাঁধছি।”

নিমু শুনে অবাক। “সে কি তুমি গান লেখ নাকি?”

হীরেমন হাসতে লাগল, “লিখতে জানি নাকি যে লিখব?”

“তবে কি মনে মনে গান বানাও?”

“না দাদা, কথা জানলে তো মনে মনে গান বানাব।”

“তবে কি কর!”

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বুড়ো বলল, “কিছু করি না। বুকের মধ্যে গান তৈরি হয়, তাই শুনি।”

“কি গান বল না।”

“সে আমার নিজের গান নয় রে দাদা, বাপ-ঠাকুরদাদের গান।”

“তাতে কি আছে?”

“কি নেই তাই বল! বাজপাখির লড়াইয়ের কথা আছে। শাল বনে আগুন লাগার কথা আছে। ধান বোনার, ধান কাটার কথাও আছে, আবার খরার বছর খেতের শস্য খেতে শুকোবার কথাও আছে। বোঙার বাড়ির কথাও আছে?”

“বোঙার বাড়ি আবার কি?”

হীরেমন আশ্চর্য হয়ে বলল, “ওমা, সে কি! বোঙার বাড়ি চেন না? তোমার ঠাকুরদা সেখানে আমার বাবার সঙ্গে লাঠি খেলে, আর তুমি বল কিনা চেন না!”

কি যেন মনে পড়ল হীরেমনের, আবার গিয়ে পাথরে বসে পড়ে পন্নুকে বলল, “নিমুদাদার চানের সময় হল, ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।”

নিমুদের বাড়ি যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু পন্নু বলল, “আমাদের বড় শুওরের পঁচিশটা ছানা হয়েছে, দেখবি নে?”

তাই দেখতে গেল পন্নু। খেজুর তলা দিয়ে যেতে হল। খেজুর গাছদের গায়ে খাঁজ কাটা, গলায় একটা করে হাঁড়ি বাঁধা। তাতে রস জমে।

ফুলমণি গ্রামের মাঝখান দিয়ে সোজা পথ চলে গেছে, ঝাটানো নিকনো তক-তক করছে। দুই পাশে দুই সারি মাটির বাড়ি। কোথাও একটা কুটো পড়ে নেই। এমন সুন্দর জায়গা নিমু আর কোথাও দেখেনি। কি ঘরে কি বাইরে সমান ঝরঝর চকচক করছে। তারই মধ্যে পন্নুদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল ওরা। অমনি পন্নুর মা নিমুর হাতে নতুন গুড়ের ছোট্ট একটি পাটালি দিল। "ধর, বাবা, নতুন লবাত, কাল বোঙাকে দিয়েছিলাম। খেলে তোমার ভালোই হবে।"

তক্ষুনি খেয়ে ফেলল নিমু, কি ভালো, কি ভালো!

ঘরটা দু ভাগ করা। এক দিকে রান্নাবান্না হচ্ছে। আরেক দিকে বড় শুওর, তার পঁচিশটা ছানা, পন্নুর ছোট ভাইবোন আর এক পিসি গাদাগাদি করে রয়েছে। পিসির নাকি ম্যালেরিয়া। বাকি সবাই যে যার কাজে গেছে, জানোয়াররা চড়ে বেড়াচ্ছে। ছানাগুলোকে কোলে তুলে আদর করে তবে নিমু বাড়ি গেল।

বাড়িতে মা-বাপির চিঠি এসেছে। নিমু ক্লাসে পাস করেছে। উপরের ক্লাসে উঠেছে। ঠামুর কাছে থেকে দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি খেয়ে যেন শরীরটা আরো ভালো করে ফেলে। মা-বাপি বড়দিনের ছুটিতে আসবে, ১লা জানুয়ারি সবাই মিলে ফিরবে। বাপি বন্দুক আনবে, মজা করে পাখি শিকার করা যাবে। নিমু চিঠিটা খাটের উপর ফেলে রেখে স্নান করতে গেল। পাখিরা না এলে বেশ হত।

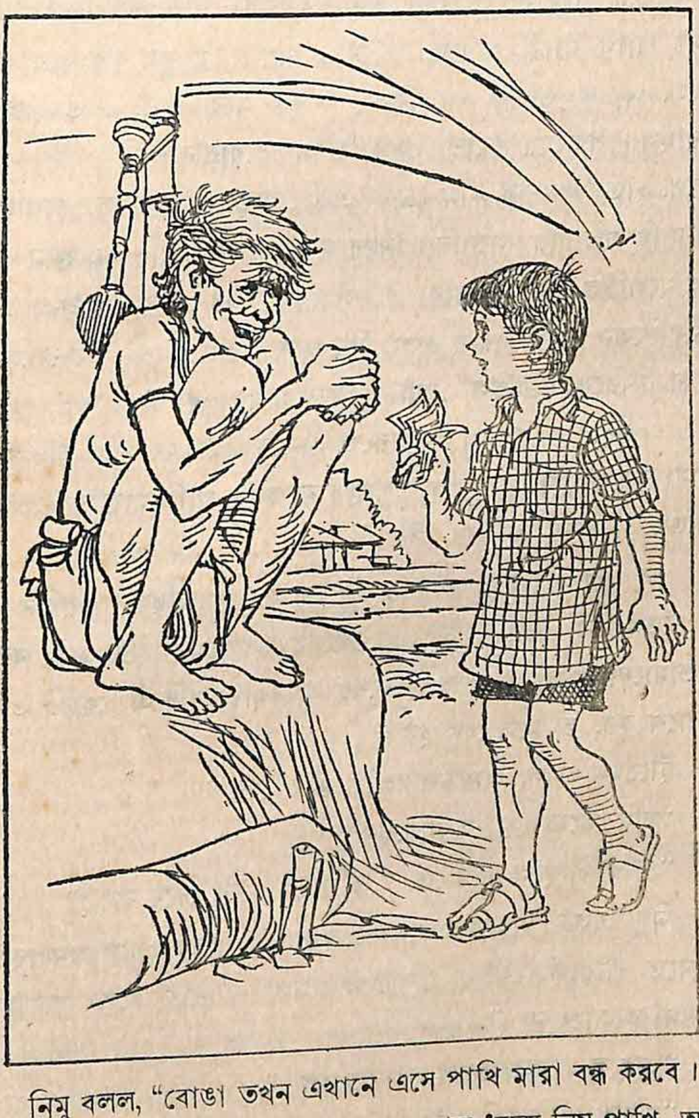
বিকেলে ঠামু নিমাইয়ের হাতে পঁচিশ টাকা দিয়ে বলল, "এই নে, বাপি পাঠিয়েছে, তোর পুরস্কার।"

পরে হীরেমন আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "এই হাওয়াটা পড়লেই দেখবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতে শুরু করবে।"

নিমু বলল, "মরা পাখিরও কি বোঙার বাড়ি যায়?"

হীরেমন হো-হো করে হেসে উঠল। "বোঙার বাড়ি যায় আবার

কি, দাদা ? তোমার বাপ-কাকারা তো বছরে বছরে হাজার পাখি মারে, সে সব পাখি বোঙার বাড়ি গেলে যে বোঙাকেই বেরিয়ে আসতে হবে। বোঙা তখন কি করবে ?"



নিমু বলল, "বোঙা তখন এখানে এসে পাখি মারা বন্ধ করবে।"

ভেবে ভেবে রাতে ঘুম হয় না। গত বছর নিমু পাখি আসা দেখেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে তারা এসেছিল। জলায় যখন

নামল, মনে হতে লাগল যেন কদম ফুলের শুকনো পাতায় জলার জল ঢেকে গেছে। কাকু আর কাকুর বন্ধু জগাই-মাধাই আরো চার-পাঁচজন লোক ভোর থেকে গুড়ুম গুড়ুম করে পাখি মেরেছিল। একজন কেউ ঢিল মেরে পাখি উড়িয়ে দেয়, অমনি বাকিরা ছোট গুলি দিয়ে মারে। বসা পাখি নাকি মারতে হয় না। মরা পাখি ঝুপ ঝুপ করে কতক জলে, কতক ডাঙায় পড়েছিল; কতক মরে চুপ, কতক ছটফট করছিল। পন্নুদের গাঁয়ের কেউ সেদিন বেরোয়নি। নিমু পাখি পড়া দেখে, হাত দিয়ে দুই কান ঢেকে এক দৌড়ে বাড়ি চলে এসেছিল। মা-বাপি গত বার আসেনি। নিমুর কাছে পাখি মারার গল্প শুনে বাপি শুধু বলেছিল, "আমার বাবা ঐ ফুলমণি গ্রামের লোকদের টাকা দিতে চেয়েছিলেন পাখি-মারার প্রথম দিন পুজো দেবার জন্য। ওদের মোড়ল টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল। অথচ বেজায় গরীব ওরা।"

এ বছর বাপিও পাখি মারতে আসবে। বোঙা, তুমি যদি পাখি আসা বন্ধ কর, তা হলে কি ভালোই না হয়। পাখি মারতে দিও না, বোঙা, পাখিদের তাড়িয়ে দিও।

এই সব ভাবতে ভাবতে নিমু ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরদিন ঘুম ভাঙতেই দুধ খেয়ে, সটাং হীরেমনের কাছে হাজির হয়ে বলল, "তোমাদের ১লা পৌষের উৎসবের জায়গাটা যদি ঐ খেজুর তলার ওপাশে কর, তা হলে বেশ হয়।"

হীরেমন বলল, "মোড়ল বললে তবে তো।"

"তুমি মেড়েলকে বল না কেন?"

"সে রাজী হলে তবে তো? তুমি তাকে কি দেবে বল?"

নিমু একটু ঘাবড়িয়ে গেল। হীরেমন বলল, "বাজনদারদের আনতে পারলে, খেজুর তলাতেই মেলা বসাতে হবে, অন্যদিকে জায়গা কুলোবে না।"

"তাহলে বাজনদারদের আনতে বল।"

"পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ টাকায় নেমেছে তারা। মোড়লের পনেরোর বেশি নেই।"

নিমু পকেট থেকে তার পঁচিশটা টাকা হীরেমনকে দিয়ে বলল, "মোড়লকে দাও, দাদু, বাজনদাররা সারা দিন রাত ঢাক পিটোলে, পাখিরা ভয়ে এখানে নামবে না। বাপিরাও ওদের মারতে পারবে না।"

হীরেমনের কুঁজো শরীরটা তীরের মতো সোজা হয়ে উঠল। তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। নিমুর হাত ধরে টানতে টানতে সে মোড়লের কাছে হাজির হল। মোড়ল প্রথমটা ঘাবড়াচ্ছিল, পরে হীরেমনের কথায় ঐ টাকা আর নিজের পনরো টাকা দিয়ে, বাজনদারদের আনিয়েছিল। তারা খেজুর তলায় মেলার এক মাস ঢাক পিটিয়েছিল। পাখিরা নামেনি। ঝাঁকে ঝাঁকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছিল। কাকুদের কি রাগ। জগাই মাধাই এলই না।

কিন্তু বাপির সঙ্গে হীরেমনের অনেক দিনের ভাব। প্রথম দিনই হীরেমনের সঙ্গে খুব খানিক গল্প করে এসে, রাতে খাবার সময় মুচকি হেসে নিমুকে বলেছিল, "কি রে, বোঙা নাকি এ বছর পাখি তাড়িয়েছে?"

কাকু বলল, "হুঁঃ!"

পাখিরা আর কখনো ফুলমণির জলায় নামেনি। প্রত্যেক বছর বাপি মোড়লের কাছে বাজনদারদের জন্য টাকা দেয়।

আঁধারমণি

বনের ধারে বুড়োর বাড়ি, সেখানে বুড়োর সঙ্গে থাকে তার নাতি শম্ভু আর শম্ভুর পিসি। বুড়ো বনে বনে ঘোরে; পিসি ঘরে বসে রাঁধে-বাড়ে, জামায় ফোঁড় তোলে, ঘরদোর গুছোয়। আর শম্ভু পাঠশালে পড়ে, টিয়াপাখিকে পড়তে শেখায়, ছোলা খাওয়ায়, বেড়ালের সঙ্গে খেলা করে, ঘরের চারখানি দেয়ালের মধ্যে বড় নিরাপদে বড় আরামে থাকে।

এমনি করে শীত গেছে, বসন্ত গেছে, গ্রীষ্মও গেছে, এবার বর্ষা এল বলে। গাছদের আর তর সয় না, সারা বনময় কিসের একটা শিরশির সরসর, ঐ বুঝি আকাশে নীল মেঘ জমা হল, বৃষ্টি বুঝি এল ঐ !

বুড়ো বনে ধূপকাঠ কাটে, মধু খোঁজে, গাছগাছড়া তোলে। একদিন কেমন করে হাত ফস্কে, গেল গাছ থেকে পড়ে। আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে, এখুনি বিষ্টি নামবে, বুড়ো হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে, কোনোরকমে ব্যথায় ভরা শরীরটাকে টেনে এনে ঘরে এসে উঠল।

পিসি বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল, পাখি অবাক হয়ে চেয়ে রইল, বেড়াল তফাতে সরে বসল, শম্ভুর বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। তার বড় ভয়।

কোবরেজকে খবর পাঠানো হল, বুড়োর পা-খানি আর নড়ে না, তা কোবরেজের দেখা নেই। দিন তার আলোর জাল গুটিয়ে নিলে, বনময় আঁধার জমে এল, তারই মধ্যে ঘনঘটা করে বাদলা নামল। দোর এঁটে সবাই মিলে সময় গোনে, কখন আসবে কোবরেজ।

বুড়ো চোখ বুজে পড়ে থাকে, কথা কয় না, পিসির ভাবনা হয়, শম্ভুর হয় ভয়। শেষটা আর থাকতে না পেরে পিসি বলে, "কি হবে শম্ভু, কোবরেজ যে এখনো এল না ? শেষটা পা-টা ফুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় ? এরপর রাত আরো বাড়বে, ঝড়ও বেড়ে যাবে, আর কি সে আসতে পারবে ? তুই একবার গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আয় না।"

শম্ভু নড়তে চায় না, এই ভর সন্ধ্যেয় বাইরে যেতে সে রাজী নয়। তার ওপর এখুনি বিষ্টি নামবে।

পিসি তার হাত ধরে বলে, "টোকাটা মাথায় দিয়ে একবার যা, বাপ। দেখছিস নে দাদুর কত কষ্ট।"

শম্ভু রেগে যায়। "বিকেলে একবার গেছলুম। সে বাড়ি ছিল না তো আমি কি করব ? তার বৌকে বলেও এসেছিলুম।"

পিসি ছাড়তে চায় না। "গাছ থেকে পড়ে দাদুর পায়ে এত ব্যথা, তবু যাবি নে ?"

শম্ভু আমতা-আমতা করতে থাকে, "আমার—আমার অন্ধকারকে ভয় করে। গাছে চড়ে কেন দাদু?"

পিসি তো অবাক! "ওমা বলে কি! গাছে না চড়লে ধূপ কাটবে, মধু আনবে কেমন করে? হাটে গিয়ে ওসব বেচে তবে না আমাদের খাবার-দাবার কাপড়-চোপড় কিনে আনে! দাদু পড়ে থাকলে যে আমাদেরও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ!"

শম্ভু ঘাড় গুঁজে তবু বলে, "বনের মধ্যে দিয়ে যেতে বড় ভয় করে।"

পিসি বোঝে না, বন যাদের খাওয়ায় পরায়, তাদের আবার বনের ভয় কি?

কোবরেজ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। "আমি নেপাল কোবরেজ, জল এসেছে জোর, দোর খোলো গো।"

পিসি দোর খুলে দেয়, টোকার জল ঝাড়তে ঝাড়তে কোবরেজ এসে ঢোকে। বলে, "দাঠাকুর আবার প'ল কেন? দেখি, পা-খান একবার দেখি।" দাদুর পা দেখে কোবরেজ মাথা নাড়ে, বুড়ো কথা কয় না।

পিসি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "কেমন দেখছ কোবরেজ? ভালো হবে তো? তোমার দুটো বড়ি খেলে সেরে যাবে নিশ্চয়?"

কোবরেজ খুশি হয়ে যায়। "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, দিদি। এবার আমার সাদা পাথরের খলে এমনি ওষুধ মেড়ে দোব—কিছু বললে দাঠাকুর?"

এতক্ষণে বুড়ো দাদু কথা কয়। থেমে থেমে বলে, "তোমার খলে মাড়া ওষুধ খেয়ে বনের ছেলেরা কখনো ভালো হয়, কোবরেজ? চোখে যাদের সবুজ রং, নাকে যাদের গাছগাছালির গন্ধ, কানে যারা সদাই শোনে পাতার মাঝে বাতাসের শিরশির, বন যে তাদের রক্তে মেশা! ও ওষুধে তাদের কিছু হয় না।"

কোবরেজ, পিসি, শম্ভু, বুড়োকে ঘিরে থাকে। টিয়ে দাঁড় ছেড়ে কাছে আসতে চায়, বেড়াল এসে বিছানার গরম খোঁজে। বুড়ো উঠে বসে, "শম্ভু, দোর খুললে কি দেখা যায়?"

"বড় বড় গাছ দেখা যায়, তাদের মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখা দেয়।"

"আর কি দেখা যায় ?"

"আর একটা পথ এঁকেবেঁকে গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, তাই দেখা যায়।"

"কোথায় গেছে ওপথ, দাদা ?"

"গাছের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে, ছোট নদীতে পাথর ফেলা, তাই পার হয়ে, শুষনির পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে ঐ পথ।"

বুড়ো বলে, "যাবে সেখানে ?"

শম্ভু ভয়ে কেঁপে ওঠে, "না, না, না, আমার ভয় করে।"

"কিসের ভয় ?"

শম্ভু বলে, "বনের ভয় ; আঁধারের ভয় ; রাতে যাদের চোখ জ্বলে —তাদের ভয়, ঝোপের মধ্যে খড়খড় করে যারা, পায়ের তলা দিয়ে সড়সড় করে চলে যায় ; তাদেয় ভয়, যাদের নখ আছে, দাঁত আছে, তাদের ভয় ; আকাশ আঁধার করে, কালো ডানা মেলে ওঠে যারা, তাদের ভয়। বন যে ভয় দিয়ে ঠাসা, দাদু।"

বুড়ো নিশ্বাস ফেলে বলে, "তবে তো আর হল না !"

শম্ভু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, "কি হল না, দাদু ?"

বুড়ো বলে, "ঐ শুষনির চুড়োতে, কালো পাথরের বুকে আঁধার-মণি-গুহা আছে। তারই মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছে। হাজার বছরে কেউ সে মধু নেয়নি। পুরনো হয়ে সোনার মধুতে লাল বরণ ধরেছে। সেই মধু এনে, শুষনির চুড়োয় সূয্যির আলো লাগার আগে, আমার পায়ে মালিশ করলে, তবেই আমি সেরে উঠব। কিন্তু কে আনবে সে মধু ?"

তাই শুনে কোবরেজ উঠে পড়ে ঝোলাঝুলি গুছোতে লেগে যায়। পিসি উঠে দাঁড়ায়। শম্ভু চেঁচিয়ে বলে, "আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন তোমরা ? আমি পারব না, আমার ভয় করে।"

কোবরেজ বলে, "রাতবিরেতে পাহাড়ে চড়া বুড়ো হাড়ের কম্ম নয়। তাছাড়া চোখে ভালো দেখি নে।"

পিসি বলে, "বনবাদাড়ে আঁধার রাতে ওযুধ আনা তো মেয়েমানুষের কাজ নয়। তাছাড়া রুগীর দেখাশুনো আছে।"

দোর খুলে কোবরেজ বিদেয় নেয়। বাসন-পত্র কুড়িয়ে নিয়ে পিসিও হেঁশেলে যায়। বুড়ো বলে, "তুমি ভয় পাও দাদু? জানো না, ভয়ের মুখে আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে?"

শম্ভু চিৎকার করে বলে, "না, না, না, রাতের অন্ধকারে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে আমি পারব না, পারব না।"

বুড়ো বলে, "তবে থাক।" পাশ ফিরে শোয়।

ঘরখানি নিঝুম হয়ে যায়। প্রদীপের আলো জ্বলে, শম্ভু সেই দিকে চেয়ে থাকে। আলোর শিখা নড়েচড়ে, দেয়ালে ছায়া দোলে, ঢোলে, ঘরের আসবাব যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, তারা কথা কয়। শম্ভুর কানে কানে কথা কয়। কথা ক্রমে জোর হয়ে ওঠে, কান ঝালাপালা হয়ে যায়, ঘরদোর, ঘরের পাখি বেড়াল সবাই যেন কথা কয়।

তারা বলে, এ ঘরেতে আরাম বড়, এখানে আরামে, গরমে, নিরাপদে শুয়ে থাকো। চেয়ে দেখে শম্ভু—চারদিক ছায়াময়, মায়াময়, তারই মাঝে আলোর শিখা চেয়ে রয়, কথা কয়। বলে শিখা, "ভয় আবার কিসের গা? যেখানে আলোর রেখা পড়ে ভয় সেখানে থাকে না।"

চারদিকে চেয়ে দেখে শম্ভু, চেনা ঘরকে নতুন করে চেনে, দেখা জিনিসকে আবার দেখে। এই তাদের ঘরখানি কি ভালো, কি ভালো! একে ছেড়ে যাওয়া যায় কখনো? বাইরে বিষ্টি নামছে, বিজলি হানছে, যদি কোনো বিপদ হয়, আর যদি না-ই ফেরা হয়?

দাদু তো ঘুমিয়ে পড়েছে, আর পা ব্যথা টের পাচ্ছে না। কাল সকালে আরামের বিছানাতে শুয়ে শুয়ে শম্ভু শুনবে—পিসি বলছে, "ওমা, দেখ'সে, দাদুর পা একেবারে সেরে গেছে!"

কিন্তু যদি না সারে? কিছুতেই যদি না সারে? পাহাড় চুড়োর আঁধারমণি-গুহা থেকে লাল মধু না আনলে, আর যদি নাই ভালো হয়?

আর বসে থাকতে পারে না শম্ভু। ঘুরে ঘুরে চেনা ঘরকে আবার চেনে, পুরনো জিনিসকে নতুন করে আবার দেখে। দরজার আগল একটুখানি আলগা করে, অমনি বাইরের ঝড় হুড়মুড় করে ঘরে আসতে চায়। দোর এঁটে দেয় শম্ভু।

দোর এঁটে আলোর কাছে এসে বসে শম্ভু। আলো যেন কমে যায়, সরে যায়। ঘরের কোণে দাহুও এপাশ ওপাশ করে, আলো প্রায় নিবু-নিবু। দাহুর কথা মনে পড়ে,—আলোর শিখা পড়লে, ভয় যায় পালিয়ে।

তাকের ওপর থেকে ঝড়ের বাতি নামায় শম্ভু, ঘরের প্রদীপ থেকে জ্বালে। দেয়াল থেকে টোকা পাড়ে, কোণা থেকে মাটির ঘড়া নেয়। অমনি মনে হয় ঘর আলোয় আলোময়। আলো যেন কান ঝালাপালা করে গান গেয়ে ওঠে, ভয় নেই, ভয় নেই।

শম্ভু দোর খুলে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে এসে দোরে ঠেস দিয়ে চারদিক চেয়ে দেখে।

অমনি চারদিক থেকে রাত তাকে ঘিরে ফেলে, বন তাকে ঘিরে ফেলে। পায়ের নিচে পথ দেখতে পায় না শম্ভু। চোখে দেখে—আঁধারে ভরা কালো কালো ছায়ার মতো গাছপালা বনবাদাড়। কানে শোনে—শিরশির সরসর খুসখুস খসখস। কে যেন ডানার ঝাপটা দেয়, কিসের বুনো গন্ধ আসে নাকে। ভয়ে শম্ভু কাঠ হয়ে যায়।

শুষনির পাহাড়ের পেছনে বিজলি চমকায়, গাছপালার মাঝখান থেকে কারা যেন ডেকে বলে, "শম্ভু ভয়ে ঘেরা বাইরে, সঙ্গে কেউ নাইরে ?"

ভয়ে শম্ভুর হাত পা হিম হয়ে যায়, দুপা এগোয় তো দুপা পেছায়। ভালো করে কিছু ঠাওর হয় না। সব কিছুকে অন্য রকম মনে হয়। জোর করে সাহস আনে শম্ভু, কাঁপা গলায় বলে, "কে আছ বাইরে ? কে ডাকছ আমাকে ? কোথায় তোমরা, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে ?"

হাওয়া তার কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "এই যে, এই যে, এই যে, চোখের সামনে নেই যে !"

শম্ভু বলে, "আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে। এসো, আমার সামনে এসো, একবার ভালো করে দেখি।"



যেমনি আলো তুলে ধরে শম্ভু, ছায়ারা সব সরে সরে যায়, ভয়ের আওয়াজরা কোথায় মিলিয়ে যায়। শম্ভু দেখে, কোথাও ভয়ের কিছু নেই। লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায়, সরু পথ বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে-

বেঁকে শুষনির পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। সময় তো বেশি নেই, পাহাড়-চুড়োয় সূয্যির আলো লাগবার আগেই বাড়ি ফেরা চাই।

দৌড়ে পাহাড় চড়তে চায় শম্ভু। মনসার ঝোপরা বাধা দেয়। মাগো, কাঁটা ভরা, গায়ে পায়ে ব্যথা লাগে। ঝোপের তলায় আঁকা-বাঁকা কি লুকিয়ে আছে কে জানে!

মাথা ঘুরে যায় শম্ভুর। ইদিক-উদিক চায়, পথ দেখতে পায় না। আবার মনে হয়, বড় বড় গাছরা বুঝি কাছাকাছি সরে আসছে, হাজার ঝুরি নামিয়ে পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। মনে হয়, ডালের ওপর বিশাল অজগর সাপ কুণ্ডুলী পাকিয়ে রয়েছে, কানে আসে যেন তার ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস! দারুণ ভয় করে শম্ভুর। ভাবে, পা টিপে টিপে ফিরে যাই, তাহলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু তাহলে ওষুধের কি হবে?

পথ দেখবার জন্য যেই আলো তুলে ধরেছে শম্ভু, অমনি গাছদের গায়ে আলো পড়েছে। দেখে, গাছদের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে ঐ তো পথ চলে গেছে। মাথার উপর কুণ্ডুলী পাকিয়ে রয়েছে ও তো সাপ নয়, ও যে গাছেরই ডাল, পাকিয়ে জড়িয়ে তাল হয়ে রয়েছে! মনে পড়ে, দাদু বলেছিল, আলো পড়লে ভয় যায় পালিয়ে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে হুতুম প্যাঁচা ডাকে। ওদের বাঁকা ঠোঁট, ভাঁটা চোখ, জোরালো পাখা, ধারালো নোখ, ছোট জানোয়ার পেলে তার আর বাঁচা নেই।

চিৎকার করে শম্ভু বলে, "না, না, না, ভয় পাব না, ভয় পেলে ওষুধ আনা হবে না। আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে। কে আমাকে ভয় দেখায়, তাকে ভালো করে দেখি তো!"

লণ্ঠন তুলতেই যেই না প্যাঁচার চোখে আলো পড়েছে, চোখ গেছে ঝলসে। আঁধারের জীব কি আর আলো সইতে পারে? চোখ বুজে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে প্যাঁচা। চারদিকে আলোর জয়।

শম্ভু ভাবে, আর বেশি দূর নেই, ঐ যে চুড়ো দেখা যায়। গাছের আড়ালে ঐখানে গুহা থেকে মধু নিয়ে ঘরে ফিরতে কতটুকু সময়

লাগে ? এখানটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভয়গুলোকে পেছনে ছেড়ে আসা গেছে, বাঁচা গেছে ! ফেরবার সময় অন্য পথ ধরব।

অমনি দূর থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে, ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া। শেয়ালরা বড় খারাপ জানোয়ার, বড় শিকার ধরতে পারে না, তাই যা পায় তাই খেয়ে নেয়। অন্ধকারের বুক চিরে সে কি বিকট ডাকাডাকি ! গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শম্ভু, আর বুঝি মধু আনা হল না।

পাগলের মতো ছুটে পালাতে চায় শম্ভু, হাত থেকে আলো পড়ে যায়, ঘড়া পড়ে যায়, আলো প্রায় নিবু-নিবু। কোন দিকে যাবে দিশে পায় না, গাছে ঠোক্কর লাগে, হোঁচট খেয়ে কিসের ওপর উবু হয়ে পড়ে যায়। হাতড়ে দেখে, এ যে তারই লণ্ঠন, তুলে ধরতেই অমনি জ্বলে ওঠে। চারদিক হয়ে ওঠে আলোয় আলোময়, বন-বেড়ালরা ল্যাজ গুটিয়ে দূরে পালায়, শেয়ালের ডাক থেমে যায়।

এই তো কত উপরে উঠে এসেছে শম্ভু। সামনে দেখা যায় আঁধারমণি-গুহার মুখ। এখখানেই পথের শেষ, আর ভয় নেই।

ভাবে শম্ভু, ভয় নেই, কিন্তু গুহার মুখটা অত কালো কেন ? হাজার বছর ও মধুতে কেউ হাত দেয়নি কেন ? তবে কি কোনো ভয়ের কিছুতে ওখানে বাসা বেঁধেছে ? কি করে যাই ওখানে ?

যেই না ভাবা, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে বিরাট কালো বাদুড় গুহা থেকে বেরিয়ে এসে, শম্ভুর চারদিকে ঘুরতে থাকে। কি বিশ্রী জানোয়ার সব, অন্ধকারে দাঁতের সারি চকচক করে, গায়ে বিকট সোঁদা গন্ধ, গুহার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

গুহায় থাকে কেন ? আলো সইতে পারে না বলে ? আলোকে ভয় পায় ? নিজের চোখ ঢেকে পালিয়ে যাচ্ছিল শম্ভু, যেই না এই কথা মনে পড়েছে, অমনি হাত নামিয়ে আলো উঁচু করে ধরেছে, চারদিক আলোয় আলোয় ভরে গেছে। বাদুড়রাও অমনি ডানা গুটিয়ে আলোয় পাশের ঝোপেঝাড়ে মিলিয়ে গেছে।

চারদিকে বাতির আলো ছড়িয়ে পড়ে, গুহার কালো মুখ আলো হয়। সেই আলোতে শম্ভু দেখে, গুহা ভরা থোলো থোলো মৌচাক ; চাক থেকে মধু উপচে পড়ছে, তাই এক পাশ থেকে ঘড়া ভরে নেয় শম্ভু। ছোট ঘড়া ভরতে বেশি সময় লাগে না।

তারপর চেয়ে দেখে একি ! অন্ধকার ফিকে হয় কেন ? ভোর হয়ে এল নাকি ? চুড়োর ওপর সূর্যের আলো লাগবার আগেই যে দাদুকে ওষুধ দিতে হবে। তবে আর দেরি নয়। বুকের কাছে মধুর ঘড়া আঁকড়ে ধরে, আলো উঁচু করে, মাথা উঁচু করে, পাহাড় থেকে নামে শম্ভু।

চারদিকে আলো ছড়ায়, আকাশের রং ফিকে হয়ে আসে, ভয়রা সব ভয় পেয়ে সরে যায়, বাদুড়রা ডানামুড়ে জড়োসড়ো। বন-বেড়ালরা লুকোবার জায়গা খোঁজে। শেয়ালদের মুখ চুণ। প্যাঁচারা গিয়ে কোটরে ঢোকে। কালো গাছ আলো হয়, ঝোপে-ঝাড়ে আলো লাগে। অবাক হয়ে শম্ভু দেখে, যে পথ দিয়ে যেতে খানিক আগে এত ভয়, এখন সেখানে ফুলে ফুলময়, ভয়ের কোনো জায়গা নেই।

পাহাড়ের নিচে পৌঁছতে না পৌঁছতে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, বুড়ো দাদুর ছোট ঘরের দোর খুলে যায়। কোবরেজকে সঙ্গে করে পিসি বেরোয় শম্ভুর খোঁজে। শম্ভুকে দেখে তারা তো অবাক ; শম্ভুর ভয় গেল কোথায় ?

কোবরেজ আর পিসি ছুটে গিয়ে শম্ভুকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মই

আমাদের অফিসের বিপিনদাকে দেখে বোঝা যায় না উনি কি রকম দুর্দান্ত লোক। বেঁটে-খাটো রোগা লিকলিকে, ছোট ছোট করে আধপাকা চুলগুলো ছাঁটা, অজস্র পান খেয়ে ঠোঁট কালো, দাঁত লাল। শনি মঙ্গলবার মানেন, বৃহস্পতিবারে যাত্রা করেন না, বেরুবার

সময় টিকটিক করলে আবার বসে পড়েন, কেউ 'কচ্ছপ' বললে তখনি হাতের কাজ ছেড়ে দেন, অথচ বে-পরোয়া অভিযাত্রী। কোথায় না গেছেন, কি না দেখেছেন। রাতে মাঝে মাঝে কাজ কম থাকলে সে-সব কথা আমাদের বলেন, শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়। রক্ত টগবগ করে ফোটে। ওরকম অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমরা ভাবতেই পারি না, আহরণ করা দূরের কথা! আর পড়াশুনোই বা কত! যেখানে গেছেন সেখানকার ইতিবৃত্ত কিংবদন্তী নখের আগায় করে ফিরেছেন। এমন লোক আমাদের কাগজের সহ-সম্পাদক হবে না তো হবেটা কে? আমরা ওর অধীনে কাজ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করি।

এই পুজোর ঠিক আগে বেজায় কাজের ভিড়, কেউ নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছে না। তার ওপর মাথার ওপরকার বড় আলোটার বাল্বের তার কেটে গেল। তারিণীও তেমনি তৎপর, পত্রপাঠ লম্বা মই এনে তরতর করে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময় বিপিনদা ঘরে ঢুকে মইয়ের তলা দিয়ে প্রায় চলেই এসেছিলেন, দুঃখের বিষয় শেষ মুহূর্তে খেয়াল হওয়াতে যেই না পাশ ফিরেছেন, মইয়েও পড়েছে টান, তারিণীর অধঃপতন, নতুন বাল্ব ভাঙন কাটা ছেঁড়া, চ্যাচামেচি, জলপট্টি, আইডিন।

তারপর সব আবার ঠাণ্ডা হবে, আমি আর একটা বাল্ব এনে মই বেয়ে উঠে, লাগিয়ে দিলাম। বিপিনদা তারিণীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তারিণী, কিছু মনে করিস্ নে, বাপ। তুই একটু সুস্থ হলেই এরা তোকে চপ-কাটলেট খাওয়াবে। জানিস্ তো বুধবারে আমি ওসব ছুঁই না। আর মইয়ের কথা আর কি বলব তোকে, বিশ্বাস কর্ আমার মনে কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু একবার এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে মইয়ের নিচে দিয়ে আমার পক্ষে হাঁটা অসম্ভব।"

তারিণী উঠে বসে চিঁ-চিঁ করে বলল, "কেন, কি হয়েছিল?"

বিপিনদা বললেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ব্যাপার। তোরা কেউ কেউ জন্মাস্নি, বাকিরা বোমার ভয়ে ঝাড়গ্রাম গেছিস্ আর

আমি তখন অতি গোপনীয় সংবাদের ধান্দায় মধ্য-উইরোপের মরুভূমি অঞ্চলে। আশেপাশে তখনো যুদ্ধ চলেছে, তবে ঠিক ঐ জায়গাটাতে মানুষই বিশেষ নেই, তো যুদ্ধ!"

তারিণী বলল, "কোন জায়গাটা?"

বিপিনদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "বলছি তো বাইবেল বর্ণিত মধ্য-ইউরোপে, যেখানে ইউরোপে এশিয়াতে মিলন হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস সেখানে জীবন্ত। দেখলে তোদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত। আর সে কি গরম! তার খানিকটা জায়গা হল পৃথিবীর নিম্নতম স্থান, ডেড-সী যেমন। বাইবেলের প্রথম অংশের অকুস্থল সে-সব, যীশু তাদের কাছে ছেলেমানুষ। এই সব জায়গা দিয়েই চার হাজার বছর আগে মুসা মিশর থেকে বন্দী ইহুদীদের পথ দেখিয়ে 'কেনা-আনে' নিয়ে এসেছিলেন।

অতি দুর্গম জায়গা, মরুভূমি, পাথুরে পাহাড়, উঁচু-নিচু ভাঙা জমি, তাকে কোনোমতেই পথ বলা যায় না। মানুষের জন্য তৈরি নয়, এক ছাগল বা টাট্টুঘোড়া যেতে পারে। এরই কাছে ডেড-সীর ধারে গুহার মধ্যে আড়াই হাজার বছরের পুরনো ডেড-সী স্ক্রোল পাওয়া গেছিল, যা নিয়ে তারিণী ফলাও করে লিখে গত বছর খুব নাম কিনেছিল। আমি সে জায়গা স্বচক্ষে দেখে এসেছিলাম।

অনেকগুলো গুহা; কয়েকটা এত উঁচুতে যে নাগাল পাওয়া মুশকিল। তারই একটাতে একটা ছাগল ঢুকে গেছিল, তাকে বের করার জন্য যেই না রাখাল ঢিল ছুঁড়েছে, অমনি হুড়মুড় করে কি সব ভেঙে পড়ল! গিয়ে দেখে হাঁড়ায় ভরা ছাগল ভেড়ার চামড়ায় লেখা আড়াই হাজার বছরের পুরনো সব পাণ্ডুলিপি। কতকগুলো তামার পাতলা ফলকে আঁচড় কেটে লেখা।

নিজের চোখে দেখে এলাম ওরই কাছে প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের মঠের ধ্বংসাবশেষ। বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ মঠের সাধুরাই পাণ্ডুলিপি-গুলো তৈরি করেছিলেন। এমনি একটা কুঠরিও দেখলাম, সম্ভবত সেইখানে বসেই লেখা হয়েছিল, দুটো কালির দোয়াত পর্যন্ত সেখানে

পাওয়া গেছিল। যীশু তখনো জন্মাননি, তখন থেকেই রোমক সৈন্যের সে কি অত্যাচার! তাদের ভয়েই, মঠের সাধুরা পাণ্ডুলিপি-গুলোকে দুর্গম চারটে গুহায় মাটির হাঁড়িতে ভরে, লুকিয়ে রেখে-ছিলেন। রোমক সেনারা মঠ ভেঙে তাঁদের উৎখাত করে ছেড়েছিল। পাণ্ডুলিপির কথা কেউ টেরও পায়নি। আড়াই হাজার বছর পরম নিরাপদে রক্ষিত ছিল; হালে আবিষ্কার হয়েছে।"

তারিণী বলল, "মইয়ের কথা বললেন না?"

বিপিনদা চটে গেলেন, "আহা, ও জায়গা তো আর আমার গন্তব্য-স্থল ছিলনা যে মইয়ের কথা উঠবে। পথে যেতে ঐসব চোখে পড়েছিল তাইবললাম। আমি যাচ্ছিলাম এখন যেসব অঞ্চলকে জর্দান বলে সেখানে।"

"জর্দান নদীর তীরে নাকি?"

"জর্দানকে নদী বলিস না। আরে ছোঃ, কাদাজলে ভরা একটা নালা ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, সেখানে আমার এক সঙ্গী জুটে গেল। তার নাম বলল ইজাক, সেখানকার লোক। ভাবনা হল গুপ্তচর নয় তো? আমার গোপন অভিসন্ধির কথা জানতে পারলেই তো হয়ে গেল! যাই হোক, জানিস্‌ই তো সহজে আমি ভয় খাই না। বরং সে থাকাতে আমার খাওয়াদাওয়ার অনেক সুবিধাও হয়ে গেল, বিনি পয়সায় একটা গাইডও পাওয়া গেল।

কথায় কথায় ইজাক বলল, 'এত দূরেই যদি এলেন, পেট্রা না দেখেই ফিরে যাবেন?' গায়ে কাঁটা দিল। মুখে বললাম, 'পেট্রা আবার কি?' ইজাক আকাশ থেকে পড়ল। 'পেট্রার নাম শোনেননি? কথায় বলে পাথরের গোলাপ পেট্রা নগর। আড়াই হাজার বছর আগে নবতীয় দস্যুরা ঐ আস্তানা গেড়েছিল। তাদেরইশহর পেট্রা। পাথুরে পাহাড়ের গোপন কন্দরে তাদের ঘাঁটি ছিল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে সারি সারি উট বোঝাই রেশম, কিংখাব, বহুমূল্য গালচে, মণিমাণিক্য, সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে বণিকরা যেত। তাদের কাছ থেকে নবতীয়রা পারানি আদায় করত। না দিলে সব কেড়ে-কুড়ে নিত। এমনি করে তারা দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে গেছিল।"

তারিণী বলল, "কোন ভাষায় এত কথা বলল সে ?"

বিপিনবাবু একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইংরিজিতে। ওখানে অনেকেই ইংরিজি বলে তাও জানিস্ না ? সে যাই হোক, ইজাক বলল, 'যেতে পারেন আমার সঙ্গে। সারাজীবন মনে রাখার মতো জায়গা। কাছেই মুসার দাদা আরণের কবর আছে, সেখানে অনেকে পাঁঠা বলি দেয়। আপনাদের দেশেও তো পাঁঠা বলির নিয়ম আছে।' আমি বললাম, 'পাঁঠা খেলে আমার গায়ে চাকা চাকা বেরোয়।'

বলা বাহুল্য পেট্রাই আমার আসল গন্তব্যস্থল। যদিও তার বিষয়ে এত কথা জানতাম না। সেখানে এক সরাইখানা আছে, সেই সরাইখানায় একজন গুপ্তচর আমাকে একটা চিরকুট দেবে। এর বেশি কিছু বলা বারণ ছিল। তাছাড়া ভুলেও গেছি। কাজেই ইজাকের কথায় হাতে চাঁদ পেলাম। কোথায় যেতাম একা একা ?

কিন্তু পথ বড় খারাপ, এতটুকু সমান জায়গা নেই যে পা রাখব, একটু অসাবধান হলেই পা হড়কে যায়। তবু বাইবেল বর্ণিত সব স্থান, তাদের একটা মহিমা থাকবেই, সে আমি হিঁদুই হই আর যাই হই। হাজার হোক মানবজাতির জন্ম ওখানে।"

তারিণী বলল, "কে বলেছে ?"

"ইজাকই বলল, নইলে আমি জানব কোত্থেকে ? এখন শোন্ তো। খানিকটা এবাড়োখেবড়ো জমি, খানিকটা খাড়াই, তারপর মরুভূমি, তার মধ্যে একটা মরূদ্যান। ইজাক বলল, 'চার হাজার বছর আগে মিশর থেকে ফেরার পথে মুসার দলের লোকেরা এই অবধি এসে খিদেয় তেষ্টায় বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিল। তখন এখানে মরূদ্যান ছিল না। শুধু ধু-ধু বালি। মুসা দৈব-বাণী শুনে একটা প্রকাণ্ড শুকনো পাথরে লাঠির বাড়ি দিতেই, পাথরের বুক থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। সে জলের ধারা আজ পর্যন্ত শুকোয়-নি। ঐ দেখুন মুসার ঝরনা।'

দেখলাম বাস্তবিকই তাই! সেই জল খেলাম পর্যন্ত। ইজাক বলল, 'তারপর খিদে মেটাবার জন্য আকাশ থেকে মিষ্টি রুটির বৃষ্টি

হল। সে রকম রুটি বেদুইনরা এখানো বানায়, চেখে দেখবেন নাকি ?' আমি বললাম 'উঁহু, বেজায় শক্ত।' ইজাক বলল, 'নেবেন নাকি এক শিশি মুসা-ওয়াডির পবিত্র জল ?' পেটের ব্যামোর অব্যর্থ ওষুধ। সামান্য দাম। আমি যোগাড় করে দেব।'

বললাম, 'আমার গুরুর নিষেধ আছে।'

ইজাক বলল, 'যা বলেন। তবে ইহুদী, মুসলমান, খৃস্টান, সবাই এ-সব জায়গাকে ভক্তি করে, আপনার গুরু যা খুশি বলতে পারেন। এইখানে মরুভূমির শেষ। সামনের ঐ গ্রাম থেকে টাট্টু ঘোড়া, গাধা বা খচ্চর যা হয় ভাড়া করে নিতে হবে। আর পায়ে চলা যাবে না।'

আমি বললাম, 'ঘোড়াই দেখ, গাধা বা খচ্চরে চাপতে পারব না।'

ইজাক বিরক্ত হল না, শুধু বলল, 'যেমন বলেন, টাট্টুর ভাড়া বেশি। কিন্তু যীশু মুসা যা চড়ে বেড়াতেন তাকে যদি যথেষ্ট ভালো মনে না করেন—।' এই বলে দুটো টাট্টু ভাড়া করে আনল।

দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ছোটবেলায় দার্জিলিং-এ কত টাট্টু চেপেছি, ঘোড়া-ফোড়ায় আমার কিছু করতে পারবে না। তবে এদের লাগাম-টাগাম ছিল না, স্রেফ খালি পিঠ, মুখে দড়ি। তাই সই। ঐ বন্ধুর পথে টাট্টু চালানো তো আর আমার কম্ম নয়, দড়ি ধরে বসে রইলাম, টাট্টু নিজের ইচ্ছেমতো চলতে লাগল।

অতি সাবধানে পাথরের মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছি, হঠাৎ দেখি বাঁয়ে একটা অদ্ভুত অট্টালিকা। ঠিক অট্টালিকাও নয়, তার তো ভেতর থাকে; এটা স্রেফ নিরেট পাহাড়ের গায়ের পাথর কেটে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের সামনের দিকটা বানিয়েছে, কিন্তু তার পেছনে কোঠা দালান কিচ্ছু নেই, শুধু একটা অন্ধকার গুহা। অদ্ভুত ব্যাপার।

তারপরেই পাথরের মধ্যে সরু একটা ফাঁক, মাত্র কয়েক ফুট চওড়া। ইজাক তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল, পেছনে পেছনে আমার টাট্টুও।

দু পাশে দেখলাম দু-তিন শো ফুট উঁচু খাড়াই পাথরের দেয়াল, হাজার হাজার বছরের জলে-ঝড়ে ক্ষয়ে গিয়ে অদ্ভুত সব আকার নিয়েছে। পরতে পরতে আলাদা রং, কিন্তু সবই পাটকিলে, মেটে,

বেগ্‌নি, গোলাপী। অনেক উপরে একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেখানে থেকে এক চিলতে রোদ একেক জায়গায় পড়ছে আর অমনি ফিকে গোলাপী, গাঢ় গোলাপী, লাল, বেগ্‌নি রং ঠিকরোচ্ছে।



ইজাক বলল, 'মাত্র পাঁচটা লোক এখানে বিশাল সৈন্য ঠেকাতে পারত। জায়গাটার নাম এখনো বড় খারাপ। স্থানীয় লোকরা অন্ধকারের পর এদিকে মাড়ায় না। এই তো সেদিনও একদল ফরাসী

মেম টাট্টু চেপে এই পথে পেট্রা দেখতে যাচ্ছিল। দিব্যি ফুটফুটে দিন, ঝকঝকে রোদ। হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল জলস্রোত এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় বৃষ্টি হয়ে থাকবে। চলুন এই তিন মাইল পথ যত তাড়তাড়ি সম্ভব পার হওয়া যাক।'

হঠাৎ পথ শেষ হয়ে গেল, মাথার ওপর খোলা আকাশ, টাট্টুর পায়ের নিচে পাথরের স্তূপ। ইজাক বলল, 'ঐ দেখুন, পাথরের গোলাপ পেট্রা নগর, স্বপ্নেও যার দেখা পাওয়া যায় না।'

আমি তো স্তম্ভিত ; একি সত্যি শহর, নাকি মায়া ? প্রাচীন কালের একটা বাঁধানো সড়কের ওপর, সারি সারি অপূর্ব কারুকার্য-খচিত পাথরের প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি ! যেমনি তাদের খোদাই কর্ম, তেমনি তাদের রং, যেন মণিমাণিক্য দিয়ে গড়া ; লাল, বেগ্‌নি, গোলাপী, চোখ ঝলসিয়ে গেল।

ইজাক বলল, 'ঐ প্রথমটা ছিল নবতীয়দের ধনাগার, ওটাকে খাজ্‌নে বলে।'

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। এ আবার কেমন ঘর-বাড়ি, সামনেটা আছে, পাশ নেই, পেছনে নেই। ঢোকবার অপূর্ব প্রবেশ-দ্বার, কিন্তু অন্দর নেই। পেছেনে শুধু দুটি-তিনটি করে অন্ধকার গুহা। তার মধ্যেও অপূর্ব কারুকার্য। কি হত এখানে ? ওর মধ্যে বাস করা কি সম্ভব ? নাকি গুদোমঘর, না সমাধি, না কি, কে জানে।

এটুকু বলতে পারি এমন শহর দুনিয়াতে কোথাও নেই। অট্টালিকাশোভিত রাজপথ, কিন্তু একটিও ঘর নেই। আস্তে আস্তে সবটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সব নিরেট পাথর কেটে তৈরি, ইট কাঠ বা জোড়াজুড়ির চিহ্ন নেই।

ইজাক বলল, 'খাজ্‌নের সদর দরজার মাথায় ঐ যে মস্ত ভাণ্ড দেখছেন, একেবারে নিরট পাথরে কোঁদা ? স্থানীয় প্রবাদ ওটি হীরে মাণিক দিয়ে ঠাসা। কিন্তু নাগালের বাইরে। ওপর থেকে দড়ি বেয়েও নামা যায় না, নিচে থেকে মই লাগিয়েও ওঠা যায় না। বন্দুকের গুলি ছুঁড়েও কেউ ভাঙতে পারেনি। ঐ দেখুন গুলির দাগ।"

আমার মুখে কথা সরছিল না—"কি হল তারিণী, ফোঁস করলি যে ?"

তারিণী বলল, "না, এতক্ষণ পরে মইয়ের কথা বললেন কি না ।"

বিপিনদা বললেন, "এই ? আমি বলি না জানি কি । হ্যাঁ, একটি-মাত্র তৈরি বাড়ি ছিল বটে, একটা রোমক মন্দির । সেটা অনেক পরে তৈরি, স্থানীয় লাল পাথর দিয়ে, দেখতে মন্দ নয় ।"

ইজাক বলল, 'চলুন হোটেলে জায়গা দেখা যাক । রাতটা কাটিয়ে, ভোরে ফিরবেন ।'

হোটেল শুনে আমার আসল কাজের কথা মনে পড়ল । জিজ্ঞাসা করলাম । 'হোটেল কাদের জন্য ? এই দুর্গম স্থানেও যাত্রীরা আসে নাকি ?'

ইজাক হাসল, 'তা আসে না ? দেখতে তো আসেই, তার ওপর এটাকে নানান দেশের গুপ্তচরদের একটা ঘাঁটিও বলতে পারেন । আসুন, খানকতক ঘর আছে, নয় তো তাঁবুর ব্যবস্থা আছে, নয় তো প্রাচীন কুয়ো আছে । যা চান ।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'খোঁজ নাও তো হোটেলে নবাগত কেউ এসেছে কি না ।'

ইজাক অবাক হল, 'নবাগত ? নবগত তো মাত্র দুজন, আপনি আর আমি । আসুন ভালো খাবার দেয় ।'

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল । চিরকুট নিয়ে লোকটা তো এল না । হোটেলে কয়েকজন সাহেব মেম টুরিস্ট দেখলাম । খেলাম-দেলাম ভালো, দুজনে এক ঘরে শুলাম । পরদিন সকালে হোটেলের যৎ-সামান্য চাহিদা মিটিয়ে দিয়ে আবার সেই আশ্চর্য রাজপথ ধরে, সেই অপূর্ব গিরিখাদ দিয়ে বহির্জগতে ফিরে এলাম । ইজাক আমাকে মরুভূমি ছাড়িয়ে বাস ঘাঁটি অবধি পৌঁছে দিল । ওর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছিল, বিদায় নেবার সময় বললাম, 'স্বর্গ দেখালে আমাকে ইজাক, এ আমি কখনো ভুলব না । তবে আমার একটা কাজ ছিল, সেটা হল না, এই যা ।'

ততক্ষণে বাসে স্টার্ট দিয়েছে ; ইজাক আমার হাত ধরে

গুড্‌বাই করে বলল, 'সেজন্য দুঃখ করবেন না, স্যার। সাহেবেরা বেশি টাকা দিয়েছে, চিরকুট তাদের দিয়েছি।'

আমি তো থ, 'ইজাক, তুমি? তুমি? কেন দিলে ওদের?'

ইজাক বলল, 'তাতে কি হয়েছে স্যার? যুদ্ধ ওদের। আপনি আমি ছা-পোষা মানুষ, আমাদের সঙ্গে তার কি?'

"ঐ তার সঙ্গে শেষ দেখা।"

বিপিনদা গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারিণী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু মই? মইয়ের কথা বললেন না?"

বিপিনদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "মই? কোন্‌ মই? ছোটবেলায় চুঁচড়োয় মামার বাড়িতে মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে চুনের বালতি মাথায় উল্টে চোখটোখ প্রায় জ্বলে গেছিল, সেই ইস্তক মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটি না। তোরা কি রে? পাথরের গোলাপে মন ওঠে না, খালি মই আর মই! মই আবার একটা কিছু ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস নাকি—আহা-হা তাই বলে আমার মাথার ওপর দিয়ে ওটা নিয়ে যাচ্ছিস্‌ কেন বল্‌ তো!"

বুচকি

ট্রেনটা থামতেই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুপ করে ঐ অতখানি উঁচু থেকে নেমে পড়ল গাবি। জায়গাটা কিছু একটা সত্যিকার স্টেশনও নয়। স্রেফ আঘাটা। সামনে পেছনে কোথাও কোনো স্টেশনের চিহ্নও দেখা গেল না। দুপাশের খেতের ধান কোন্‌কালে কাটা হয়ে গেছে, তারপর আর কিছু পোঁতা হয়নি। হয়তো জলের অভাব। ন্যাড়া মাঠগুলোর ঠিক যেন খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে। খেতের মাঝখান দিয়ে একটা খাল গেছে। তাতেও জল নেই, তলা দেখা যাচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখল গাবি, কোথাও

কিছু চোখে পড়ল না, শুধু দূরে একটা পুকুরই হবে নিশ্চয়, উঁচু পাড়ি, চারদিক তালগাছে ঘেরা। একবার কাকুর সঙ্গে গাড়িতে সিউড়ি যেতে এই রকম পুকুর দেখেছিল গাবি। তাতে জল ছিল না। নিচে খানিকটা পাতলা কাদায় কি যেন থপ-থপ করছিল আর গাঁয়ের ছেলেরা খালি গায়ে কাদায় নেমে ছেঁড়া গামছায় ন্যাটা মাছ ধরছিল।

কি ভালো এই জায়গাটা। চারদিকে বিকেলের লালচে রোদ। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বুনো হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক বলে ডাকতে ডাকতে তীরের ফলার মতো হয়ে, উত্তর দিকে উড়ে গেল। কাকু বলেছিল ওরা শীতের আগে আমাদের দেশে আসে আর শীত কেটে গেলে হিমালয় পেরিয়ে আরো উত্তরে উড়ে যায়। কাঁধের থলিটা খুব হাল্কা নয়।

বেশ জায়গাটা। গাবির গায়ে হাতকাটা ময়লা সার্ট, দড়ি বাঁধা নীল ইজের ; পায়ে মলিদিদির সেই আরামের কালো চটিজোড়া, যেটা গাবি পায়ে দিলেই ওরা চটে যায়। হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙার জন্য থলিটাকে নিচে নামিয়ে রাখল গাবি।

থলি বলল, 'কেঁউ'। জামা ইজের ঝেড়ে-ঝুড়ে, কাকুর দেওয়া নতুন মনিব্যাগটা একবার খুলে দেখা গেল। ভিতরে শুধু একটা এক টাকার নোট। খুচরোগুলো বাঁদর-বিস্কুট কিনতেই গেছে। তবু এক টাকাই বা কম কিসে?

চমৎকার একটা হাওয়া দিতে লাগল। কাকু বলেছিল এ বছর অনেক দিন শীত ছিল বলে শিমুল পলাশ ফুটছে কৃষ্ণচুড়োর সময়। কাল রাতে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই অনেক শিমুল ফুল বনের ধারে গাছের গোড়ায় ঢিপি হয়ে রয়েছে। পা দিয়ে একটু নাড়তেই কি রকম একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এল। হাঁচি পেল।

ন্যাড়া ধানখেতের মাঝখান দিয়ে একটা গরুর গাড়ির পথ গিয়ে, উঁচু হয়ে, একটা পুলের ওপর দিয়ে শুকনো খালটাকে পেরিয়েছে। সব চেয়ে উঁচু জায়গাতে নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো দেখতে একটা গরুর গাড়ি চলেছে। গাবি সেই পথে হাঁটা দিল।

বোধ হয় কাল রাতের বৃষ্টির জন্য ধুলোগুলো বসে গেছে, পায়ের নিচে নরম মাটিতে হাঁটতে ভারি ভালো লাগল।

আরো অনেকটা হাঁটল গাবু। নতুন বাঁধের রাস্তা, দুদিকে গাছের ছায়ার বালাই নেই। ছোট ছোট বাবলা, মুচুকুন্দ, কাঠচাঁপা। এতদূর হাঁটেনি কখনো গাবি। বাড়ি থেকে স্কুল, কিংবা বাড়ি থেকে বাজার, বা বড়-মুদীর দোকান; কি ভালো ভালো মটকা, কদমা আর পিচ-বোর্ডের মুখোস রাখে বড়-মুদী। ঐটুকু যেতে দিতেও ঠামুর কি আপত্তি। আর মলিদির তো কথাই নেই। বাঞ্ছারাম সঙ্গে যাক। নয় তো হয় গাড়ি চাপা পড়বে, নয় তো ছেলেধরায় ধরবে। একটা আট বছরের ছেলেকে ধরে কখনো ছেলেধরায়?

মলিদি হল ঠামুর ছোট বোন। দিদিদের স্কুলে ভূগোল পড়ায়। নাকি বিলেত গেছিল একবার। দেখে তো মনে হয় না। খালি এটা করো না, ওটা করো না, রোদে যেও না, সর্দিগর্মি হবে, মাথা ঘুরবে জ্বর আসবে। কই, এই তো এতটা পথ রোদে হাঁটা গেল। মাথা ঘুরল, নাকি জ্বর এল? তবে পায়ের পাতাটা একটু একটু ব্যথা ব্যথা করছিল। তার ওপর ঠিক এই সময় ফট্ করে মলিদির কালো চটির বড় স্ট্র্যাপটা দু টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল॥

পথের পাশে খোয়ার ঢিপি। তার ওপর বসে পড়ল গাবি। অমনি থলিটা বলল, 'কেঁউ'।

কি আশ্চর্য! এতক্ষণ গাবির বুচকির কথা মনেই ছিল না। এখন থলির মুখ খুলতেই একটা মাস তিনেকের কালো কুকুর-বাচ্চা চোখ পিটপিট করতে করতে বেরিয়ে এল। মোলায়েম লোম, কটা চোখ, সরু ল্যাজ, সর্বাঙ্গে একটা নেড়ি-নেড়ি ভাব হলে কি হবে, বেজায় মিষ্টি। থলি থেকে বেরিয়েই মাথা দিয়ে গাবিকে ঠেলতে লাগল। পকেট থেকে ঠোঙা বের করে, অগত্যা তাকে আগে দু-চারটে বাঁদর-বিস্কুট দিতে হল।

মাথার ওপর দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে আরেক ঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল।

গাবির সমস্ত শরীরটা শিরশির, চিড়চিড় করে উঠল। আর বসে থাকা যায় না। এই পথটাও উত্তর দিকে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে শেষটা হিমালয় পৌঁছনো যায়। হিমালয়ের খাঁজে খাঁজে অনেক গিরিপথ আছে। তাই দিয়ে সন্ন্যাসীরা আর তিব্বতী বণিকরা সর্বদা যাওয়া-আসা করতেন। ইয়ে—মানে, অনেক দিন হাঁটলে সেখানেও যাওয়া যাবে আর বুচকিকেও কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। বুনো হাঁস কোথায় যায় দেখতে হবে।

থলেটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে, বুচকিকে বগলে নিয়ে, গাবি হাঁটতে লাগল। কি এমন খারাপ কুকুর বুচকি? শিশি বোতলওয়ালার পেছন পেছন কাল এসে বাড়িতে ঢুকেছিল। নাকি সারা সকাল তার সঙ্গে ঘুরেছিল।

সে নিজেই বলল, "উঠোকে রাখেন বাবুজি, বিলিতি কুকুরও হতে পারে। এরই মধ্যে তো তিন-চার আদমিকে কেমড়িয়েছেন।" তাই রেখে দিয়েছিল গাবি। আর কাকু রাতে বাড়ি এসে, বুচকিকে দেখে হাত পা নেড়ে সে যে কি চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল ভাবা যায় না। সে নাকি ভালো কুকুর আনবে, হেনা-তেনা কত কি। মলিদিও ঐ সঙ্গে জুটল।

শেষটা ঠামু যখন বলল, "আজ রাতটা থাক। কাল সকালে যেখানে হয় ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।" গাবি বলেছিল, "তা হলে না খেয়ে মরে যাবে না বেচারি?" শুনে সকলের কি হাসি। "অ্যাদ্দিন কে ওকে দুবেলা মাছ-ভাত দিয়েছে শুনি? রাস্তার কুকুর-বাচ্চা আবার না খেয়ে মরে নাকি?"

শেষ পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠেই, আর কেউ জাগবার আগেই চলে আসতে হয়েছিল। বাড়ির কাছেই স্টেশন, অত ভোরে কেউ বড় একটা ছিলও না। কাকুর মাছ ধরার থলিতে বুচকিকে পুরে অগত্যা রওনা দেওয়া। মাছের গন্ধ পেয়ে বুচকি কোনো আপত্তিও করেনি। গাবি নিজে মুখও ধোয়নি, দাঁতও মাজেনি। ঠিক হয়েছে। মনিব্যাগে বাপি মামণির দেওয়া এক টাকা ত্রিশ পয়সা ছিল। তার ত্রিশ পয়সা দিয়ে

বুচকির বিস্কুট কেনা হয়েছে। বাপি মামণি বোম্বাই থেকে ফিরে নিশ্চয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। বিজ্ঞাপন দেখলেই গাবি ফিরে আসবে।



কিরির কিরির বঁক বঁক করতে করতে একটা অদ্ভুত মোটরগাড়ি পাশে দাঁড়াল। কালো ময়লা প্যাণ্ট শার্ট আর একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ নিয়ে একটা রোগা লোক ঝুপ করে নেমে পড়ে বলল, 'চলেন স্যার, বড়ই একা পড়েছি। আর আপনারও তো এক পায়ে চটি। নিন উঠুন, পানাগড়ের ফালতু পার্টের দোকান থেকে কিনে, পার্টগুলো জুড়ে জুড়ে

ক্যায়সা একখানা বানিয়েছি বলুন। সাধে বলে ঘরে তৈরি জিনিসের তুলনা হয় না।'

কোনো কথা না বলে গাবি উঠে লোকটার পাশে বসে পড়ল। উফ্, এতক্ষণে পা দুটোতে আরাম হল।

লোকটা বলল, "থলি কাঁধে, এক হাতে চটি, এক হাতে কুত্তো, চলেছেন কোথায় ? আমার আবার একটা কাজের লোকের দরকার। করবেন নাকি ?"

গাবি বলল, "করতে পারি, যদি বুচকিকেও থাকতে দাও। বুচকি নেড়ি কুত্তো। রাস্তা থেকে এসেছে। কামড়ায়।"

লোকটি মহা খুশী। "ওয়া ! ওয়া ! তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের ক্যাম্প পাহারা দেবার জন্য ঐ রকমেই খুঁজছিলাম। আর বাড়তি খাবার-টাবার খেয়ে ফেলার জন্য একটা লোক। খাবার নষ্ট করতে নেই কি না।" লোকটাকে কেন জানি খুব চেনা চেনা মনে হল।

অদ্ভুত লোকটা। সারাদিন ঘুরল গাবি ওর সঙ্গে। একটা পুলের পাশে বাবলা গাছের নিচে গাড়ি থামিয়ে, দুটো বাবুই বাসা পেড়ে লোকটা আবার গাড়িতে উঠে বসল।

গাবি বলল, "কি করবে ?"

"বাসা পাতব। ক্যাম্পের ছাদের কোণায় ঝুলিয়ে রাখব। বাবুইরা নিজেই এসে ডিম পাড়বে। তবে ঘাঁটাঘাঁটি করলে, মানুষের গন্ধ পাবে, অমনি চলে যাবে। মানুষ বড় খারাপ জিনিস।'

সে বিষয়ে গাবিও এক মত, তাই খুশী না হয়ে পারল না। লোকটা বলল, "বেড়ে বানিয়েছে। তলায় কেমন একটেরে করে যাওয়া-আসার পথ করেছে। পাশের দেয়ালে খাপের মধ্যে ডিম থাকে, বাসা দুললেও পড়বার ভয় নেই। খাপের পাশে একদলা মাটি দেখেছ ?"

গাবি তো অবাক ! "মাটি কেন ? তাতে আবার কালো পোকা গোঁজা কেন ? খায় বুঝি ?"

লোকটা আশ্চর্য হয়ে গেল। "কিছুই জান না দেখছি। ওটা

জোনাকি পোকা। সারারাত ডিমে তা দিতে হবে না? বাচ্চা ফুটলেই তো আর তার চোখ ফোটে না। শেষটা অন্ধকারে মাড়িয়ে-টাড়িয়ে একাকার করার ভয় আছে না? তাই ঘরে আলো দেবার জন্য, জোনাকি ধরে, নরম মাটিতে গুঁজে রাখা হয়।"

সারাদিন লড়ঝড় করতে করতে কত কি দেখল ওরা। খরগোশের বাসা; মাটির ওপরে ঝোপে-ঝাড়ে ঢাকা একটি গর্ত। যেই না বুচকি খরগোশকে তেড়ে গেল, অমনি টুপ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভিতরে নাকি গলি-ঘুঁজি ভরা শহরবিশেষ। মৌ-টুসির বাসা। ছোট্ট একটা বাবুই বাসার মতো, কিন্তু বেরুবার পথ ওপরে, আর বাসার গায়ে নরম শণ, পাট লাগানো, মাছের আঁশ দিয়ে সাজানো। সাপের খোলস। তাকে নির্মোক বলে। সারা শীত ঘুমিয়ে থেকে সাপ রোগা হয়ে গিয়ে, পুরনো, খোলসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে। নতুন খোলস গজায়। পুরনোটা গাছের ডালে ঝুলে ছিল। মনে হচ্ছিল শুকনো সাপ বুঝি। গাবি ভয় পেয়েছিল।

দুপুরে লোকটা একটা গাঁয়ের দোকান থেকে মুড়ি, পেঁয়াজি আর তালের পাটালি খাওয়াল। তারপর কখন সন্ধ্যে হয়ে গেল বোঝাই গেল না। বুচকি আর গাবি ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। ঘুম ভাঙল ক্যাম্পে পৌঁছে। ক্যাম্পে মানে একটা আমবাগানের ধারে চার-পাঁচটা ফেলে দেওয়া পুরনো বাস্ দিয়ে সে যে কি চমৎকার বাড়ি তৈরি হয়েছে সে আর কি বলব। তারই একটাতে গাবিদের টেনে তুলে গরম হাত-রুটি আর মাংসের ঝোল খাওয়াল লোকটা। ক্যাম্পের অন্যদের জিজ্ঞাসা করল, "মালিক এসেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে কাকুও এসে উপস্থিত। ঐ নাকি মালিক!

কাকু বলল, "কিরে ব্যাটা, আমার ক্যাম্পটা কেমন মনে হচ্ছে?"

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল গাবি, কাকুর কথায় লাফিয়ে উঠে বলল, "এইটা তোমার ক্যাম্প? এইখানে তুমি রোজ আস নাকি?"

"নিশ্চয় আসি। তবে একটা হিংস্র পাহারাদার কুকুর দরকার এখানে, বুচকিকে রেখে যাবি নাকি?"

তখুনি দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটার হাতে গাবি বুচকিকে তুলে দিয়ে, শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। একবার মনে হল সে লোকটা এক-টানে দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে বাঞ্ছারামদা হয়ে গেল। চমকে সটাং উঠে বসল গাবি। আরে তাই তো! অবাক হয়ে বলল, "তু-তু-তুমি!"

বাঞ্ছারামদা নিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "উফ্, আর বলেন কেন, স্যার! সারারাত কাল আপনাকে পাহারা দিয়েছি! তারপর ভোর থেকে ঐ মোটরে করে রেল গাড়িকে ফলো করেছি! মালিক তো হুকুম দিয়ে ঘুমিয়ে কাদা! তাহলে আমাকে কিছু দেওয়া হোক।"

গাবি বলল, "ঐ তো বুচকিকে দিলাম।" বলেই সে কি ঘুম।

এবে লাক্ড়ি

ছোটবেলায় বাবার মুখে একটা ছড়া শুনতাম। লম্বা মতো একটা বাঁশের লাঠি ঘুরিয়ে, বাবা বলতেন, (বলা বাহুল্য হিন্দীটুকুর অশুদ্ধি মার্জনীয়):

"এবে লাক্ড়ি, তুমকো পাক্ড়ি।
তুম কাঁহামে থে?"
"হাম জঙ্গলমে থে।"
"তুমকো কৌন লায়া?"
"শেখ সেকান্দার, হামকো বাদশা লায়া।"
"ক্যা করনেকো?"
"জমি জরিপ করনেকো।"
"সেকেগা?"
"আলবৎ সেকেগা।"

বাবা ভারতীয় জরিপ বিভাগের কাজে জীবন কাটিয়েছিলেন, তাই আমাদেরও জরিপের কাজের উপর ভারি একটা মমতা ছিল। শুনেছিলাম আগে ঐ লাঠি দিয়েই অনেক দেশে জমি মাপা হত। জমির মাপ প্রসঙ্গে ইংরিজিতে 'রড' ও 'পোল' শব্দের ব্যবহার ছিল। তার মানেই লাঠি। সে যাই হোক, বাবার সময়ে লাঠির চেয়ে ত্রিকোণমিতি ও থিয়োডোলাইট ইত্যাদির ব্যবহার বেশি ছিল। জরিপ বিভাগে কাজ করতে হলে যেমন হওয়া দরকার, বাবাও ছিলেন ঠিক তেমনি। এ ধরনের কাজের জন্য কতকগুলি বিশেষ গুণের দরকার হয়, তার কিছুটা নিয়ে জন্মাতে হয়, বাকি আয়ত্ত করা যায়। বলিষ্ঠতা, অটুট স্বাস্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, দুঃসাহস এই সব না হলে চলে না। অঙ্কের মাথা চাই, ছবি আঁকতে পারলে ভালো। এ-সব গুণই বাবার ছিল। হকি ক্রিকেট খেলতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, বন্দুক ছুঁড়তেন, উপরন্তু বেজায় ডানপিটে আর একগুঁয়ে।

পাহাড়ে বনে জঙ্গলে যেখানে তখনো সভ্য মানুষের যাতায়াত ছিল না, এমন সব জায়গায় ছিল তাঁর কাজ। তদানীন্তন ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব এলাকাটা ছিল তাঁর নখদর্পণে। ঐ দিকের গিরিপথ দিয়ে গিয়ে শ্যামদেশ ও বর্মার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি যথারীতি সার্ভে করে সেখানকার প্রথম মানচিত্র প্রণয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। তবে বর্তমান কাহিনী তাই নিয়ে নয়। বাবার 'বনের খবর' গ্রন্থে সে বিষয়ে কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

বাবা বলতেন তাঁর রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতাগুলি জরিপের কাজের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সার্ভের কাজ শুরু হয়েছিল এ-দেশে ইংরেজ শাসনের পত্তনের সময় থেকে এবং এ কাজের অন্ত নেই। পরে কৌতূহলবশত এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করে, বিচিত্র রহস্যময় অবিস্মরণীয় কাহিনীর সন্ধান পেয়েছি। ভবিষ্যতের সাহিত্যিকদের জন্য একটি গোটা সোনার খনি অপেক্ষা করে আছে। জরিপের গুরুত্বের কথা অনেকেই হয়তো জানে না। জরিপ মানে মাপা, জমি মাপা। কিন্তু সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার বা ভারতীয় জরিপ বিভাগের

কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক। এ কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় এদেশে ইংরেজ রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজাগিরি চালাবার সুবিধার জন্য, দেশটাকে জানবার কোনো আগ্রহ থেকে নয়। কিন্তু কাজের বেলায় স্বার্থশূন্য আগ্রহী লোকের অভাব দেখা গেল না।

এত বড় একটা দেশ, এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর পাঠানো বা সৈন্য কিংবা কর্মী পাঠানো বড় সহজ কথা ছিল না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব, মাঝপথে কোন্ কোন্ পর্বত মরুভূমি নালা নদী, ঘন বন ও দুর্বৃত্ত শত্রু দেখা যাবে, এ-সব অতি প্রয়োজনীয় তথ্য কারো জানা ছিল না। বেশি পথঘাট ছিল না, নদীর ওপর সেতু সব জায়গায় ছিল না। সে সবই তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তার জন্য এঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। গোড়ায় সামরিক এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে থেকেই জরিপ বিভাগের কর্মী বাছাই করা হত। তার উপর এদের হওয়া চাই অসমসাহসিক, কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান ও উৎসাহী।

এ দেশের লোকের সাহায্য ছাড়া জরিপের কাজ চলত না। এরাই গাঁয়ে গাঁয়ে বনে বাদড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে নালাতে ঘুরে ঘুরে নির্ভুল সব তথ্য এনে দিত। জরিপের কাজে এরা ক্রমে দক্ষ হয়ে উঠল। নির্ভুলভাবে পাহাড়ের উচ্চতা, নদীর দৈর্ঘ্য ও গভীরতা, স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা, অবস্থা, মনোভাব, এরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করে দিত, কোনো বিদেশীর পক্ষে সেটা সম্ভব হত না।

কোনো কোনো অঞ্চলে তো সাহেবদের প্রবেশ করাই সম্ভব ছিল না, সেখানকার লোকেরা তাদের দেখলেই মেরে ফেলত। এমন কি ভারতীয় কর্মীদেরও প্রাণ হাতে করে যেত হত, কারণ সাহেবদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আছে, এ-কথা জানাজানি হলেও আর রক্ষা ছিল না। তারা তীর্থযাত্রী কিংবা ব্যবসায়ী সেজে, জরিপের ছোটখাটো যন্ত্রপাতি লুকিয়ে নিয়ে যেত।

একই পাহাড় নদীর মাপ বারে বারে জনে জনে হিসাব করে নিত, পাছে কোনো ভুল থেকে যায়। শোনা যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে ওদের মাপজোকে খুব সামান্যই ভুল থাকত। অথচ সাহেব কর্মীদের নাম যদি বা রক্ষিত হয়ে থাকে, আসল কাজ করত যেসব দিশী মানুষরা, তাদের নামও কেউ করে না। শুধু জরিপ বিভাগের খাতাপত্রে কিছু নাম পাওয়া যায়, আবার অনেকের নামের বদলে হয়ত দুটি অক্ষর, কি একটা সংখ্যা মাত্র দেওয়া আছে। যেমন মাউন্ট এভারেস্টের বা গড্‌উইন অস্টেনের নাম ধরা যাক। কর্নেল এভারেস্ট ও পাহাড়টা মাপেননি বলে জানা গেছে, নাকি শিকদার বলে একজন বাঙালী সার্ভেয়ার মেপেছিলেন। অথচ নাম হল বড় সাহেবের। নামটা নিয়েও বেশ মজার কথা শোনা যায়। সাহেব নিজের নাম উচ্চারণ করতেন ঈভ-রেস্ট। অন্যভাবে উচ্চারণ করলে চটে যেতেন। এখন পৃথিবী সুদ্ধ মানুষ ওঁর নামে পাহাড়টাকে চিনলেও, সবাই ভুল উচ্চারণ করে! গড্‌উইন-অস্টেন্‌ও তখনকার জরিপের বড় সাহেব ছিলেন বলে পাহাড়টাকে ঐ নামে উল্লেখ করা হত। তবে এখন আর ও নাম বড় একটা ব্যাবহার হয় না। সবাই বলে কে—টূ।]

ঐ অজানা অনামা ভারতীয় কর্মীদের বিষয়ে জরিপ বিভাগের খাতাপত্রে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনীও লেখা আছে। একেবারে নিরক্ষর যারা, তাদের দিয়ে মাল বওয়া, খবরাখবর পাঠানো ছাড়া অল্প কাজই সম্ভব হত। কিন্তু লেখাপড়া জানা, ইংরিজি বিদ্যাসম্পন্ন ভারতীয়দের কাছে সমস্ত ভারতবাসী আজ পর্যন্ত যে কি গভীরভাবে ঋণী, তার লেখাজোখা নেই। অথচ তাদের কাজের ফল আমরা আজ পর্যন্ত উপভোগ করছি।

মানচিত্র খুললেই দেখছি কোন্ পাহাড় কত উঁচু, কোন্ নদী কত গভীর, কত লম্বা, কোথায় কোন নগরের গ্রামের অবস্থান, কোথায় বন, কোথায় মরু। পথ গেছে কোথা দিয়ে, রেল পড়েছে কোথা। কোথায় কিসের ফলন, কিসের চাষ, কেমন মানুষের বাস। এক কথায় যে-সব তথ্য না জানলে বর্তমান জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ত, তার প্রায় সবই এদের আহরণ করা। পরবর্তী কর্মীরা সমান আগ্রহের সঙ্গে

কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে, সেদিকে লক্ষ রেখেছেন। ভারতের সব ম্যাপ জরিপ বিভাগের কীর্তি। একদিনের কাজ নয়, দুশো বছরের অবিরাম সাধনার ফল।

সিপাহী আন্দোলনের পর থেকে জরিপের কাজে একটা বলিষ্ঠ কার্যকারী ভাব দেখা গেল। সে সময়ে কুমাওনের পার্বত্য অঞ্চলে মেজর স্মিথ বলে একজন উৎসাহী ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি ছোট ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব স্কুলে ইংরিজী শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজী জানা স্থানীয় শিক্ষক রাখা হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম ছিল নয়ন সিং। বয়স কম, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, সাহসী ও উৎসাহী। জরিপের কাজের জন্য ঠিক যেমনটি দরকার। তখনি এঁকে নিয়ে নেওয়া হল। দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা অর্জনের এমন অপ্রত্যাশিত সুযোগ তিনি কি সহজে ছাড়েন। তার উপর ওদিককার ভাষা তাঁর কণ্ঠস্থ, চেহারাতে মঙ্গোলীয় ভাব, তিব্বতের অধিবাসী বলেও নিজেকে চালিয়ে দিতে বাধা ছিল না।

সে সময়ে হিমালয়ের উত্তরের ভূখণ্ডের কোনো মানচিত্র ছিল না, সেখানকার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাও ছিল না, ওদিকে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। চীন সম্রাটের আধিপত্য ছিল ও-সব জায়গায়। তিনি হুকুম করেছিলেন কোনো মোঘল, হিন্দুস্থানী, পাঠান বা ফিরিঙ্গি ও রাজ্যে পদার্পণ করলে, তার প্রাণদণ্ড হবে। তবে কি হিন্দুকুশ অঞ্চল, নেপাল-ভূটানের পার্বত্য প্রদেশ, লাসা ইয়ার্কান্দ কাশগর ইত্যাদি শহর, বিশাল সব নদী, এ সমস্তই অজানা থেকে যাবে? ইংরেজ কর্মীদের তো ওদিকে প্রবেশ নিষেধ, তাহলে ছদ্মবেশী ভারতীয় বা নেপালী কি ভোটিয় কর্মী ছাড়া উপায় কি?

এই সব শিক্ষিত পর্যটকদের জরিপ বিভাগে নাম দেওয়া হল পণ্ডিত-পর্যটক। নয়ন সিং তাঁদের মধ্যে প্রথম। দেরাদুনে জরিপ বিভাগের হেড অফিসে দুই বছর ধরে নয়ন সিং আর তাঁর আত্মীয় মণি সিংকে তৈরি করা হল। সে কি সাধারণ শিক্ষা! জরিপের যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গ্রহ তারা চেনা, তার সাহায্যে দিক্ নির্ণয়, থার্মোমিটারের

সাহায্যে পাহাড়ের উচ্চতা বের করা, অঙ্ক কষা, রেকর্ড রাখা, নিজের পদক্ষেপের মাপ দিয়ে পথের দৈর্ঘ্য, জায়গার দূরত্ব হিসাব করা, যে-সব জায়গা দিয়ে যেতে হবে সেখানকার ভাষা ও নিয়মকানুন, পোশাক ইত্যাদি আয়ত্ত করা, সব নিয়ে এক অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি। তার ওপর কাউকে কিছু বলবার জো নেই। বিদেশে তো নয়ই, দেশেও নয়, কারণ কোথায় কার গুপ্তচর লুকিয়ে আছে তাই বা কে বলতে পারে। সাধুই সাজা হোক, কি ব্যবসায়ীই সাজা হোক, তখনকার মতো কায়মনোবাক্যে তাই হয়ে যেতে হবে।

দেরাদুনে বসে বড় সাহেব মণ্টগমারি ওঁদের ডেকে বললেন যে সবচেয়ে ফলপ্রদ কাজ হয় ওঁরা যদি নেপালের ভিতর দিয়ে সোজা তিব্বতের প্রধান নগর লাসা পর্যন্ত যেতে পারেন। যাওয়া মানে বেড়াতে যাওয়া নয়; কত দূর, কত উঁচু, কি রকম আবহাওয়া, অধিবাসীদের হালচাল. গ্রাম নগর নদী বন, সব বিষয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে আনা। তার ওপর লুকিয়ে যেতে হবে। কারণ ওঁরা জরিপ বিভাগের লোক জানলে নেপালেও কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা পাওয়া যাবে না।

কাজেই দুটি কাল্পনিক পরিবেশ রচনা করা হল। স্থির হল নেপালে বলা হবে যে ওঁরা যাচ্ছেন লাসায়। চীন সীমান্তে কয়েকজন কুমাওন-বাসীর টাকা চুরি করে চোররা লাসায় গা ঢাকা দিয়েছে, তাদের কাছ থেকে ঐ টাকা উদ্ধার করতে হবে। এ-কথা শুনলে নেপালীদের সহানুভূতি হবে। আবার তিব্বতে পৌঁছে অন্য কারণ দেখাতে হবে। সেখানে বলা হবে ওঁরা তিব্বতী লামা, তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ১৮৬৫ সালে ওঁরা দুজন প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘটনাচক্রে অভিযানের শুরুতেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মণি সিং অনেক চেষ্টা করেও মধ্যতিব্বতে প্রবেশ করতে পারলেন না। তাই বলে তিনি বৃথা সময় ও শ্রম নষ্ট করেননি। পশ্চিম তিব্বতের গার্টক অঞ্চলের পথঘাট দেখেশুনে মেপেযুকে অনেক মূল্যবান তথ্য নিয়ে তিনি ফিরে এলেন।

এদিকে নয়ন সিং নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তে গিয়ালা বলে একটা উঁচু গিরিপথের মুখে পৌঁছে, দেখেন একদল ব্যবসায়ী ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস বোঝাই করে, তিব্বতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। নয়ন সিং তাদের সঙ্গে ছুটে গেলেন। সঙ্গে ছিল সামান্য টাকাকড়ি, ব্যবসায়ীরা তার অর্ধেকের বেশি নিয়ে নিল, খাওয়া-থাকা ও নিরাপত্তা বাবদ। ওদিকে গ্রামের মোড়ল তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিল যে লাসা গেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। নয়ন সিং সব কথাতে সম্মত হয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

চলেন আর পদক্ষেপ গোনেন, পরে গোপনে সব লিখে রাখেন। ব্যবসায়ীরা ছিল দুষ্টু লোক। সীমান্ত পেরিয়ে তারা নয়ন সিং-এর টাকাগুলো নিয়ে লুকিয়ে সরে পড়ল। সৌভাগ্যের বিষয় নয়ন সিং-এর ছোট হাতবাক্সটি নিতে পারল না। তার তলায় ছিল একটা গুপ্ত খোপ। সেই খোপে লুকনো ছিল জরিপের জিনিসপত্র। সাজপোশাক তিব্বতী লামার মতো। হাতে প্রার্থনা-চক্র, জপের মালা আর কাঠের ভিক্ষা-পাত্র। আবার কি চাই? নয়ন সিং অনেক দূর একলাই এগুলেন। তারপর একদল লাডাকী বণিকের সঙ্গ পেলেন। তারা মানস-সরোবর ঘুরে লাসা যাচ্ছিল। কারণ সোজা লাসা যাওয়া বারণ ছিল। তাদের সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে, অসুখের ভান করে নয়ন সিং পেছিয়ে পড়লেন। অত দূর ঘুরে গেলে তাঁর চলবে না। বৃক্ষহীন তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে লাসা অভিমুখে তিনি একাই চললেন। সেখানকার উচ্চতা ১৫০০০ ফুট, সারদিন হাড়-কাঁপানো বাতাস বয়।

মাঝে মাঝে যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়। পুণ্যলাভের আশায় তারা লামাকে খাবার জিনিস দেয়, তাতেই তাঁর কোনো রকমে চলে। চলেন আর পদক্ষেপ গোনেন আর মালা জপেন। মালাটা একটু অদ্ভুত ধরনের, বৌদ্ধ জপের মালার ১০৮টি লাল পুঁতির বদলে তাঁর মালায় ১০০টি পুঁতি। নবম পুঁতি একটু ছোট, দশমটা অপেক্ষাকৃত বড়। একশো পা ফেলে একটি করে পুঁতি সরাতেন অর্থাৎ এক হাজার পা ফেললে একটি করে বড় পুঁতিতে পৌঁছনো। সমস্ত মালাটি ঘুরে এলে

দশ হাজার পা ফেলা হয়। দেরাদুনে অভ্যাস করা হয়েছিল যাতে দুই হাজার পদক্ষেপে এক মাইল পথ চলতে পারেন। অর্থাৎ পাঁচ মাইল চললে একবার মালা ঘুরে আসে। চলবার সময় প্রার্থনা-চক্র ঘোরান।



সবাই ভাবে লামা প্রার্থনা করছেন, কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না, নির্ভুল গোনা চলতে থাকে।

বড় সুন্দর প্রার্থনা-চক্রটি। কারুকার্য করা কাঠের হাতলে চক্রটি

ঘোরে। চক্রটি হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি, তাতে ফিরোজা পাথর বসানো। তবে অন্য চক্রের চেয়ে এটা একটু আলাদা রকমের। এর ভিতরে পাকানো ছিল কাগজের টুকরো তাতে মাপ লেখা হত। চক্রের মাথাটা খোলা যেত। ভিতরে ছিল ছোট একটি দিক্-নির্ণয় যন্ত্র। ১৮৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি, অত্যুচ্চ কারো গিরি-পথ পেরিয়ে, অনেকগুলি জমে যাওয়া নদী নালা পার হয়ে নয়ন সিং লাসা নগরে পৌঁছলেন। এখানকার কাজ ভালো ভাবে শেষ করতে হলে, তিন মাস সময় লাগবে। সস্তা সরাইখানার ভিড়ের মধ্যে গোপনে তথ্য সংগ্রহ ও হিসাব করার অসুবিধা, কাজেই নিজস্ব একটা আস্তানা চাই। ওদিকে পয়সাকড়িও ফুরিয়ে এসেছে। অন্য ভাবনা চিন্তাও ছিল। একদিন তাঁর সামনেই একজন চীনে পর্যটককে বিনা অনুমতিতে লাসায় আসার জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। নয়ন সিং-এর মনের অবস্থা অনুমান করা যায়।

তবু তিনি ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। লাসা নগরকে মানচিত্রে তার যথা স্থানে না বসিয়ে ছাড়েনই বা কি করে?

লাসার বড় বড় ব্যবসাদারদের তিনি হিন্দুস্থানের বণিকরা যেভাবে হিসাব রাখে তাই শিখিয়ে, পয়সা রোজগারের উপায় করে ফেললেন। সেই পয়সা দিয়ে দুটি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। সেই আস্তানা থেকে গোপনে গভীর রাত্রে তারার অবস্থান পরীক্ষা করে, সঙ্গে আনা জরিপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, প্রায় নির্ভুল সব অবস্থান, উচ্চতা, দূরত্ব ইত্যাদির তথ্য উদ্ধার করলেন। থার্মোমিটারে তাপ-মাত্রা দেখে, জল ফুটতে কতক্ষণ সময় লাগে লক্ষ্য করে, তিনি লাসার উচ্চতাকে ১১,৪০০ ফুট বলেছিলেন। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিকরা বলছেন ১১,৮০০ ফুট। কতটুকুই বা তফাত।

নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হলে, আবার এগারো শো মাইল পেরিয়ে, হিমালয় ডিঙিয়ে, দেশে ফেরার পালা। ভাগ্য ভালো, সেই লাডাকি বণিকরাও ততদিনে মানস-সরোবর হয়ে, লাসায় এসে তাঁদের কাজ সেরে, ভারতে ফেরার তোড়জোড় করছিল। নয়ন সিং আবার তাঁদের

সঙ্গ নিলেন। তিব্বতের বিশাল সাং-পো নদীর তীর ধরে পাঁচশো মাইল যেতে দুই মাস সময় লাগল। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে নেপালের পর্বতমালা দেখা দিল।

নয়ন সিং এবার বণিকদের দল ছেড়ে পাহাড় চড়তে শুরু করলেন। গিয়া-লা গিরিপথ দিয়ে যাবার উপায় ছিল না, কারণ ওপারের মোড়লকে কথা দিয়েছিলেন লাসা গেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। কাজেই ছোট এক নাম-না-জানা গিরিপথ দিয়ে তাঁকে নেপালে প্রবেশ করতে হল। দুঃখের বিষয়, প্রথম গ্রামে পৌঁছতেই তাঁকে বে-আইনী তিব্বতী পর্যটক বলে গ্রেপ্তার করা হল। ভাগ্যিস ঐ গ্রামবাসীরা তাঁরই মতো কুমায়ুনের ভোট জাতীয় ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিরাপদে কাটমাণ্ডুতে পৌঁছে দেখেন, সেখানে মণি সিং তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর দুজনে মিলে দেরাদুন যাত্রা করলেন। এই অভিযান শেষ করতে দুই বছর সময় লেগেছিল।

এই দুই বছরে নয়ন সিং যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাকে অমূল্য বলা চলে। লাসার সঠিক অবস্থান, নেপাল থেকে হিমালয়ের উপর দিয়ে ১২০০ মাইল পথের বিস্তারিত বর্ণনা, একত্রিশটি জায়গার নির্ভুল অক্ষাংশ নিরূপণ, তেত্রিশটি পর্বত শিখরের উচ্চতা নির্ণয় আর ৬০০ মাইল ধরে সাং-পো নদীর গিরিপথ নির্ধারণ, এ-সব কম কৃতিত্ব নয়। দেশ-বিদেশে নয়ন সিং-এর খ্যাতি পৌঁছেছিল। নানান জায়গা থেকে তিনি মানপত্র ও পুরস্কারাদি পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা।

নয়ন সিং, মণি সিং-এর মতো জরিপ বিভাগের আরো বহু ভারতীয় পর্যটকরা ঐ বিপদসঙ্কুল পথে গিয়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তিব্বত থেকে চীন দেশে যাবার পথ, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৬০০০ ফুট উঁচুতে সাড়ে নশো বর্গ মাইল ব্যাপী টেরিং—নর হ্রদের অবস্থান, হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়ে এভারেস্ট পাহাড়ে পৌঁছবার পথ, এ সমস্ত মূল্যবান তথ্য এঁদের সাহায্যে লাভ করা গেছিল। একটু একটু করে জরিপ বিভাগের তৈরি মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরতে লাগল।

নয়ন সিং-এর বিখ্যাত অভিযানের পনেরো বছর পরেও সাং-পো নদের গতিবিধি সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায়নি। নয়ন সিং অনুমান করেছিলেন যে হিমালয়ের উত্তর পাশের ধার ঘেঁষে সাং-পো নদী হাজার মাইল প্রবাহিত হয়ে, সম্ভবতঃ হিমালয় ভেদ করে ভারতে প্রবেশ করে, ব্রহ্মপুত্র নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে সাং-পো নদীকে একশো মাইল পথ হিমালয়ের অগম্য গিরিপথ দিয়ে দুর্বার স্রোত বয়ে আসতে হয়েছে। সকলেই বুঝলেন এর প্রমাণ পাওয়ার একটা উপায় হল সাং-পোর জলে যদি কোনো চিহ্নিত পদার্থ ভাসিয়ে দিয়ে, লক্ষ্য রাখা যায়, সেটি ব্রহ্মপুত্রের জলরাশির সঙ্গে ভারতে ভেসে আসে কি না।

শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-বাসী একজন চীনে লামাকে এই কাজের জন্য বিশদ্ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হল। কাজটি খুব সহজ নয়। তিব্বতে পৌঁছে তাঁকে সাং-পো নদী ধরে পুব মুখে যেতে হবে যতক্ষণ না সাং-পো হিমালয়ের গিরিপথে আত্মগোপন করে। সেইখানে দশদিন ধরে নদীর জলে রোজ পঞ্চাশটি চিহ্নিত কাঠের টুকরো ভাসিয়ে দিতে হবে। টুকরোগুলি হবে এক ফুট করে লম্বা। এদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে পাহাড় ফুঁড়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানে পাহারা বসানো হবে। তাদের কাজ হবে লক্ষ্য রাখা ঐ কাঠের টুকরোর দু-চারটেও যদি জলের সঙ্গে ভেসে আসে।

লামার সঙ্গে কিনথুপ বলে একজন নিরক্ষর চাকর দেওয়া হল। কিনথুপের বাড়ি ছিল সিকিমে। এদিকে তিব্বতে পৌঁছে কিনথুপ লামাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়ে গেল। কাজের দিকে তার মন নেই, কেবলই নেশা আর ফুর্তি করে সময় কাটায়, পয়সাকড়ি ওড়ায়। শেষটা বেচারা কিনথুপকে তিব্বতী গাঁয়ের এক মোড়লের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে, জরিপের যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

এগারো মাস দাসত্ব করবার পর, কিনথুপ একদিন পালিয়ে গেল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট স্থানে সাং-পোর জলে পাঁচশো

কাঠের টুকরো ফেলা। মোড়লের গ্রাম সাং-পো নদী থেকে বেশি দূরে ছিল না। কিনথুপ নদী ধরে এগিয়ে চলল। এদিকে ওর প্রভু ওকে টাকা দিয়ে কিনেছিল, সে এমনি ছেড়ে দেবে কেন। বেচারাকে তাড়া করে প্রায় ধরে ফেলে আর কি, এমন সময় একটা গুম্‌ফা দেখে, কিনথুপ সেখানে আশ্রয় ভিক্ষা করল।

গুম্‌ফার বড় লামা মানুষটি বড় দয়ালু। তিনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনথুপকে তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নিলেন। কিনথুপ সাধু হল। চার মাস পরে তীর্থযাত্রার নাম করে ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। তীর্থে না গিয়ে সাং-পো নদীর ধারে বসে পাঁচশো টুকরো কাঠ এক ফুট লম্বা করে কেটে, পাহাড়ের গায়ে একটা গুহায় লুকিয়ে রেখে, আবার গুম্‌ফায় ফিরে এল।

ছু মাস পরে আবার ছুটি নিয়ে লাসা গেল। সেখানে চিঠি লিখে দেবার লোক পাওয়া যেত। চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করা যেত। কিনথুপ ভারতীয় জরিপ বিভাগের অধ্যক্ষকে জানাল যে নানান্ বিপদে পড়বার পর, এতদিনে অমুক তারিখে সাং-পো নদীর জলে সে পাঁচশো টুকরো চিহ্নিত কাঠ ফেলবে, সেগুলি বেরোয় কি না যেন লক্ষ্য রাখা হয়। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছেছিল এবং দো-ভাষী তার পাঠোদ্ধারও করেছিল। কিন্তু ততদিনে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে তুই বছর অপেক্ষা করার পর জরিপের লোকরা তাঁবু উঠিয়ে চলে এসেছিল। কাঠের টুকরো জলের সঙ্গে ভেসে এল কি না লক্ষ্য করার লোক ছিল না। পরে অবিশ্যি দেখা গেছিল যে বাস্তবিকই সাং-পো নদী পাহাড় ভেদ করে ভারতে এসে ব্রহ্মপুত্র নদ হয়েছে।

চার বছর পরে কিনথুপ ফিরে এলে, তাকে জরিপের অধ্যক্ষ শিমলায় বড়লাটের কাছে নিয়ে গেছিলেন। সেখানে তাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এই রকম বহু দুঃসাহসী স্বার্থত্যাগী মানুষের অসীম চেষ্টার ফলে ভারতের মানচিত্র ক্রমে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর পিছনে যে কত সাধনা, কত কষ্ট, কত সাহস আছে, ম্যাপ দেখার সময় ক'জনাই বা সে কথা মনে করে?

মাছ

কলকাতার মতো নয় এ জায়গাটা। এখানে সবাই মাছ ধরে। আর কি সব জায়গা মাছ ধরার! বিশাল বিশাল দীঘি, এপার ওপার ভালো করে দেখা যায় না। কম করে দেড়শো দুশো বছরের পুরনো। ছোড়দাদু বলেন ওর জল ছেঁচে ফেলে দিলে নাকি সেকাল বেরিয়ে পড়বে। বাতাস দিলে ঢেউ ওঠে। নৌকো ডুবে যেতে পারে। ঠাকুর ভাসান হয়।

অনেকেই ঐ সব পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন ধোয়, সাঁতার কাটে। খাবার জল নেওয়া বারণ, তার জন্য ইঁদারা আছে। পুকুরগুলোর মাঝখানটা কত গভীর কে জানে। পাড়ের কাছে এন্তার শামুক, গুগলী। বুড়োরা কেউ কেউ হাঁপানির জন্য গুগলী খান। ছোড়দাদুও খান।

খুব পুরনো বাঁধানো ঘাটে ফাটল ধরে গেছে। ধাপগুলো জলের নিচে অনেক দূর নেমে গেছে। এ বছর বেশি বৃষ্টি হয়নি, তাই জল নাকি কমে গেছে। তবু আমাদের মনে হল এখনো যথেষ্ট আছে। এখনো পুকুরে ছোটখাটো একটা তিমি ডুবিয়ে রাখা যায়। মাছ তো আছেই, মেলা মাছ। মাঝ পুকুরে ঘাই দিয়ে ওঠে, মানুষের মাথার চেয়ে বড় মাথা; রুই কাতলা কালবাউস মিরগেল। কে জানে কি মাছ সবাই ধরে। কেউ মাছ কেনে না, বরং অন্য জায়গায় বিক্রি করে। গ্রামের মধ্যে আর আশেপাশে ঐ রকম পাঁচ-সাতটা দীঘি। ছোড়দাদু বলেন এটা মাছ ধরার স্বর্গ। সকলের হাতে ছিপ দেখা যায়।

ওখানে ছোড়দাদুর বাড়িতে সমস্ত পুজোর ছুটি কাটবে, মাছ ধরাটা রপ্ত করতে হবে। এরই মধ্যে একদিন মহা হৈ-চৈ। চান করতে গিয়ে

বড় জ্যাঠাইমার হাত থেকে বারো ভারি ওজনের সাবেকি সোনার বালা কেমন করে খসে জলে ডুবে গেছে! তখুনি টের পেয়েছিলেন, কলসি ভাসিয়ে ঠিক ঐ জায়গাটিতে অপেক্ষা করে ছিলেন। সাঁতারে এরা কেউ কম পটু নয়।

তখুনি হাঁকডাক করে পরাণ জেলেকে ধরে আনা হল। সে নাকি সমুদ্রে ডুবুরির কাজ করত। একবার শুধু বলল, "এনে দিলে পাঁচ টাকা মাঠান, না আনলে কিচ্ছু না।" এই বলে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে এক ডুব। ডুব তো ডুব। আমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম।

ছোড়দাদু পাড়ে দাঁড়িয়ে এক দুই তিন চার গুনতে লাগলেন। সত্তর অবধি পৌঁছেছেন, অমনি ভুস্ করে পরাণ জেলে ভেসে উঠল, হাতে তার বড় জ্যাঠাইমার বালা। কনুই থেকে রক্ত পড়ছে। বালা ছাড়া আরেকটা জিনিসও তুলেছিল, ছোট্ট একটা শীলমোহর করা পেতলের ঘড়া। ঝাঁকালে ঝনঝন করে। খুলে দেখা গেল ভেতরে কালো হয়ে যাওয়া বড় বড় পয়সা। ছোড়দাদু বললেন, "কার মানত করা পয়সা কে জানে। বন্ধ করে আবার ফেলে দে। বললাম না জল ছেঁচলে ইতিহাস উঠবে।"

কিন্তু পরাণ জেলের কনুইতে রক্ত কেন? পরাণ বলল, "নোলক-পরা মাছ-মেয়ে কামড়ে দিয়েছে।"

সবার চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি পরাণ!

ছোড়দাদু বললেন, "ওরে, অনেকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থেকে নিশ্চয় ভুল দেখেছিস।"

পরাণ কাষ্ঠ হেসে কনুইতে ছোট ছোট দাঁতের দাগ দেখাল। কারো মুখে কথা নেই। পরাণ বলল, "ডুবুরির কাজ করি, বাবু, জলের নিচে চেয়ে দেখি। স্পষ্ট দেখলাম বড় বড় চোখ, ঠোঁটের ওপর দুটি মুক্তো ঝুলছে। আমি কি নোলক চিনি না?"

ছোড়দাদু গম্ভীর মুখে চলে গেলেন।

তারপর যে যার বাড়ি চলে গেল। পরাণকে পাঁচ টাকা আর

সন্দেশ দেওয়া হল। সেই ইস্তক আমাদের দলের সকলের মাছ ধরার সখ দ্বিগুন বেড়ে গেল। অন্যদের পরামর্শ মতো আমিও সরু বেতের আগায় বঁড়শী বেঁধে একটা ছিপ বানিয়ে ফেললাম। যদি কোনো রকমে মাছ-মেয়েটাকে ধরা যায়, তাহলে তাকে নিয়ে আমরা দেশে দেশে দেখিয়ে বেড়াব। দেশও দেখা হবে, আবার হাজার হাজার টাকাও পাওয়া যাবে। তাহলে ক্লাবের জন্য নতুন ফুটবল কেনার কোনোই অসুবিধা হবে না।

এইভাবে ওখানকার করোনেশন ফুটবল ক্লাবের একটা মাছ-ধরা বিভাগের পত্তন হল। ত্রিশজন মেম্বর ত্রিশটা নতুন ছিপ তৈরি করল। তার একটাতে না একটাতে কি মাছ-মেয়ে ধরা পড়বে না? পরাণই তো তখন ওকে বগলদাবাই করে তুলে আনতে পারত। না হয় আরেকটু কামড়াত, কি এমন হত তাতে?

ভোলা বলল, "না রে, এই ভাল। পরাণ ওকে সের দরে বেচে দিত, আমাদের দিত না। পয়সাকড়িও নেই যে কিনে নেব।"

তপা বলল, "সে না হয় হল। ধরে তারপর তাকে কোথায় রাখা হবে?"

নবু চৌধুরী বলল, "আমার বুড়োদাদুর স্নানের ঘরে টাইল বাঁধানো চৌবাচ্চা আছে, তাতে রাখা যায়। কেউ ও-ঘরে যায় না, নাকি বুড়োদাদুকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। সব অবিশ্যি বাজে কথা। আমি ওখানে মাছ ধরার সরঞ্জাম রাখি।"

"বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কি খাওয়ানো হবে? কি খায় ওরা?"

"কেন, যা দিয়ে ধরা হবে, তাই খাওয়ানো হবে। ভালো না লাগলে টোপ গিলবে কেন? তখনি বোঝা যাবে কি খায়।"

বটু বলল, "তাহলে একেকটা ছিপে একেক রকম টোপ দেওয়া হোক। আমি কেঁচো দেব, বাবা দেয়।"

ঘনা বলল, "মাছ-মেয়ে কখনো কেঁচো খায়? আমি পিঁপড়ের ডিম দেব। কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি।"

বাবু বলল, "এ রাম! চার ফেললে কেমন হয়?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চার আবার কি ?"

"ওমা, চার জানিস না ? মশলামাখা একরকম জিনিস। তার গন্ধে ছোঁক ছোঁক করে মাছরা সব ভেসে ওঠে। তখন ধর আর টপাটপ চুবড়িতে ফেল।"

ফটিক বলল, "ছিঃ ওভাবে লোভ দেখিয়ে মাছ-মেয়ে ধরাটা ঠিক হবে না।"

তপা বলল, "হাওয়া অফিসের কালো সাহেবরা রঙিন পালকের নকল ফড়িং বেঁধে টোপ ঝোলায়। সত্যি ভেবে মাছ যেই না কপ্ করে অমনি টপ করে বঁড়শী বেঁধে !"

জম্বু বলল, "উঃ ! কি নিষ্ঠুর ! ও-সব চলবে না।"

ঘণ্টু বলল, "তাহলে জাল ফেলে ধর।"

শম্ভু বলল, "এ পুকুরে ছোড়দাদু জাল ফেলতে দেবে না।"

তারপর অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে ভাবতে লাগল। কি করা যায় ? এত গভীর জলে পোলো বসানো চলবে না। ফুটো হাঁড়ি ডোবানো যায়, ঝাঁঝরি নৌকা ডোবানো যায়, কিন্তু মাছ-মেয়ে কখনই তাতে ধরা দেবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। এমন সময় উঠি-পড়ি করে জগা ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওরে, ওরা লম্প জেলে রায়দের দীঘিতে মাছ ধরছে।"

"কারা তারা ?"

"হাওয়া অফিসের কালো সাহেবরা।"

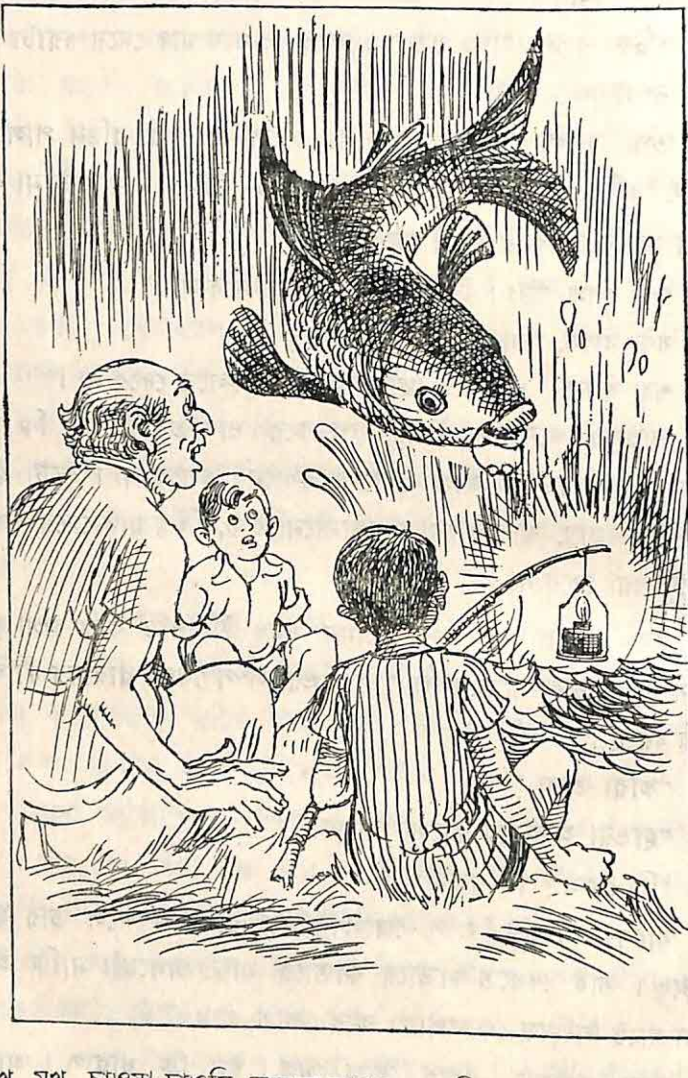
"কি রকম ? কি রকম ?"

বাঁশের ডগায় লম্প জ্বেলে ঝুলিয়ে রাখছে। জলে তার ছায়া পড়ছে। তাই দেখতে কাতারে কাতারে মাছ ভাসছে। নাকি ইচ্ছে হলে ঘাটে দাঁড়িয়ে কোলপাঁজা করে তোলা যায়।"

শুনে প্রথমটা সবাই রেগে গেল। ইস্ কি খারাপ ! আলো দেখিয়ে ভুলিয়ে আনা ! ছিঃ !

পরে মনে হল এই তো সবচেয়ে ভালো উপায়। আলো দেখতে

মাছ মেয়ে আসবে। তখন ঘাটে দাঁড়িয়ে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে ফেললেই হল। বঁড়শী বিঁধবে না, রক্ত পড়বে না, ব্যথা লাগবে না, কেঁচো কি পিঁপড়ের ডিম কি বিশ্রী কিছু খেতে হবে না। সবাই হাসি-



মুখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাড়ি যাবার পথে, একবার রায়দের দীঘি ঘুরে, কি ভাবে কি করতে হয় দেখে আসা হল।

সেদিন অনেক রাতে যারা বাড়ি থেকে বেরুতে পারল, তারা

বাঁশের আগায় পিসিমার লম্পটা জ্বেলে জলের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে, চুপ করে বসে রইল। জলের ওপর লম্পটার ছায়া ছুলতে লাগল, এরা রইল ছায়াতে। অনেক পরে জলের মধ্যে একটা নড়াচড়া দেখা গেল। সত্যি সত্যি কাতারে কাতারে মাছ এল আলো দেখতে! এদের মুখে কথা সরে না। তারপর হঠাৎ জন্বু আমার কাঁধ খামচে ধরল, ফোঁস ফোঁস করে ছু-তিনজন নিশ্বাস ছাড়ল। বড় একটা কালো মাথা জলের ওপর ভেসে উঠেছে! লম্পর আলোতে দেখা গেল, তার ঠোঁটের ওপর সোনার রিং-এ গাঁথা ছুটো মুক্তো ঝুলছে!

সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দাছু চাপা গলায় বললেন, "জলঙ্গি! তুই তা হলে এখনো বেঁচে আছিস! তুই আমি ছাড়া আর কেউ নেই রে!"

কালো মাথা তুলে প্রকাণ্ড কাতলা মাছটা বড় বড় চোখ দিয়ে ছোড়দাছুর চোখের দিকে একবার চাইল। তারপর একলাফে তিন হাত শূন্যে উঠে ল্যাজের এক ঝাপটা দিয়ে, ভু—স্ করে আবার ডুবে গেল।

ছোড়দাছু বললেন, "আমার দাদা ওকে পুষেছিল, ডাকলেই আসত। বৌদিদি ওর নাকে নিজের নোলক পরিয়ে দিয়েছিল। দাদা মারা যাওয়ার পর ওকে আর দেখিনি?"

"কবে, ছোড়দাছু, কবে?"

"তা বছর পঞ্চাশ তো হবেই।" ছোড়দাছু হোঁচট খেতে খেতে ঘরে গেলেন।

আমরা মাছ ধরা ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল বেজি পুষি।

আঁকিবুঁকি

এখান থেকে নাকি মন্দির উঠিয়ে দেবে, তাই শুনে পুরুত রেগে টং। বড় রাস্তার ধারে একটুখানি জায়গা, তাতে মান্ধাতার আমলের বটগাছের গোড়ায় ছুটো পাথর ফেলে তার ওপর সিঁছুর মাখিয়ে আরেকটা কালো লম্বাটে গোল পাথর ফেলে যদি বসে থাকা যায় আর লোকরা না চাইতেই ছুটো একটা পয়সা ফেলে দেয়, তাতে কার কি ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি? বলে নাকি তুলে দেবে, ফুট চওড়া হবে, গাছ কাটা হবে। নাকি মান্ধাতার আমলের গাছ, এই পড়ে তো সেই পড়ে, পড়বি তো পড়, কারো ঘাড়ে পলেই হয়ে গেল! তাই কেটে ফেলবে। কাঠটাও বিক্রি হবে, আজকালকার মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে তাও কিছু কম কথা নয়।

গাছের কোটরে পুরুতের ঘরকন্না, কটা টিন, ছুটো মাটির হাঁড়ি, কটা চট, একটা তুলোর কম্বল; ছেঁড়াখোঁড়া বটে, কিন্তু তকতকে পরিষ্কার। পুরুত গির্জের পাশের পুকুরে কেচে নেয়, স্নান সারে, জল তোলে। বেশ পুকুরটা। একধারে একটা নড়বড়ে পোস্তোতে সাইনবোর্ট টানানো আছে, 'এখানে স্নান করা কাপড় কাচা নিষেধ।' বেশ জায়গাটা। সাইনবোর্টের গোড়াতেই পুরুতের স্নানের জায়গা।

কালি, ভুলি, নটে, শস্তু, শস্তুর ছুই বোন, চা-ওলা, জুতো-সেলাই, কাঠ-গুদোমের বেকার লোকটা, সবাই ভাগাভাগি করে মাথা-পিছু আধ ভাঁড় চায়ের তলানি খেয়ে চাঙা হয়ে বলল, "তা হলে, কোথাও চলে যেতে হয়।" চা-ওলা বাকি চাটুকু গলায় ঢেলে বলল, "কিন্তু কোথায়?"

জুতো-সেলাইটা বড় ভীতু, সে বললে, "এখানে ওখানে চট পেতে

দিনে ছুঁচ ফাল নিয়ে বসি, রাতে ঢিপি-ঢুপি হয়ে শুয়ে থাকি ; তাও রোজ উঠিয়ে দেয়। এ-সব ছেড়ে কোথায় যাব ?"

বেকার লোকটা বলল, "কুছ পরোয়া নেই। আমার চালচুলো নেই, স্বচ্ছন্দে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে পারি।"

ছেলেমেয়েগুলো একবাক্যে বলল, "হ্যাঁ, চলেই যাই, নইলে ধরে পাঠশালে দেবে।"

চা-ওলা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "যাওয়াই ভালো। কি এমন আছে যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে ?"

ছেলেমেয়েগুলো একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরাও, আমরাও, আমাদেরও কিচ্ছু নেই, আমরাও সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব।"

চা-ওলা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "শহরটা কিন্তু বেড়ে জায়গা। সব আছে এখানে, এখানে ফকির এসে রাজা হয়ে যায়। খালি তিনটে জিনিস নেই। থাকার জায়গা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়। নাঃ, চল পুরুত, চলেই যাই।"

কালি ভুলি নটে শম্ভু বলল, "কেন, ওগুলো কি খুব দরকারী জিনিস ? আমরা তো কোনোকালেও ও সব পাই না। ও পুরুত, চল তাহলে।"

পুরুত যেন ঘুম থেকে জেগে শম্ভুর বোন দুটোকে দেখিয়ে বলল, "ওরা যাবে কি করে ? ওরা হাঁটতে পারে না।"

শুনে শম্ভু অবাক। "কেন, পিঠে করে নিয়ে যাব। মা-বাবা পালিয়ে গেছে, ওরা কি কখনো একলা থাকতে পারে।" এই বলে ওদের নোংরা গালে চুমো খেল, ওরা ওর নাক কান ধরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

পুরুত বলল, "আছে একটা জায়গা, কিন্তু সে তোদের পোষাবে কি ?"

বেকার লোকটা বলল, "কেন পোষাবে না শুনি।"

পুরুত বলল, "সেখানে যে আর কিছু নেই, খালি ঐ তিনটেই আছে।"

অমনি ওরা সবাই উঠে পড়ল, "চল চল চল চল।"

পুরুত বলল, "সেখানে হোটেল নেই, পাতকুড়ুনি পাবি নে।"

ছেলেমেয়েগুলো বলল, "এখানেও পাই না, কুকুর বেড়ালরা সব খেয়ে ফেলে!"

পুরুত বলল, "সিনেমা নেই।"

ওরা বলল, "অন্য জিনিসের দেয়ালে ঠেস দেব।"

"ট্রাম-বাস নেই, বিজলী-বাতি নেই, দোকান-পাট নেই।"

ওরা হো-হো করে হাসতে লাগল, "কোথায় পয়সা পাব যে ও-সব দেখব। ও-সবে আমাদের দরকার নেই। পাঠশাল না থাকলেই হল।"

"চাট-ওয়ালা নেই।" ওরা একবার এ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের কান মলে দেয়। ফাটকে দেবে বলে। না, পুরুত, তুমি আমাদের নিয়ে চল। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"মুনসি পালের মিনি মাগনার পাঠশালা নেই তো?"

পুরুত রেগে গেল। "বলছি কিছু নেই, ঐ তিনটে ছাড়া।"

"তবে চল, তবে চল, তবে চল।"

পুরুত অমনি উঠে পড়ে বলে, "চল।" বলে কোটর থেকে চট-কম্বল কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়।

জুতো-সেলাই তো অবাক্। "ও কি, ঠাকুর নেবে না?"

"দূর, ঠাকুর সেখানে হেঁটে বেড়ায়। গায়ের জাববাজোববার শব্দ শোনা যায় খস্ খস্ খস্।"

কালি ভুলি বলল, "এ্যাঁ! জোববা পরে নাকি? কই আমাদের তো জোববা নেই। থেটারের রাজার আছে। কি সুন্দর!"

বেকার লোকটা বলল, "তোমরা কি ঠাকুর? আহা, বড় গির্জের পাদ্রীর কাছে কি সুন্দর ছবি দেখলাম জোববা গায়ে, মেঘের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে ঠাকুর বসে আছে, এই এত্ত বড় দাড়ি, মাথায় খোঁচা খোঁচা মুটুক!"

"কেন, খোঁচা খোঁচা মুটুক কেন?"

"তা পাদ্রী বলল নাকি আলোর মুটুক, তবে কেউ নাকি চোখে দেখতে পায় না।"

"ও মা! তবে মুটুক পরে লাভটা কি?"

নটে বলল, "দুগ্‌গোঠাকুরের মাথায় সোলার মুটুকে রাংতা মোড়া। কি সুন্দর! সবাই দেখতে পায়।"

পুরুত এক পা বাড়িয়ে বলল, "সুন্দর না ছাই! খালের জলে যেই না প'ল, সব রঙ ধুয়ে সাবাড়। যাকে চোখে দেখা যায় না, তার জিনিস নষ্ট হয় না। নাও, চল।"

কালি ভুলি ব্যস্ত হয়ে উঠল, "ও কি, তোমার কালো গোল ঠাকুর সত্যি নিলে না, পুরুত? ওর দেখাশুনো কে করবে? কে ধূপকাঠি জ্বালবে, গঙ্গাজল ছিটুবে, বাতাসা খেতে দেবে?"

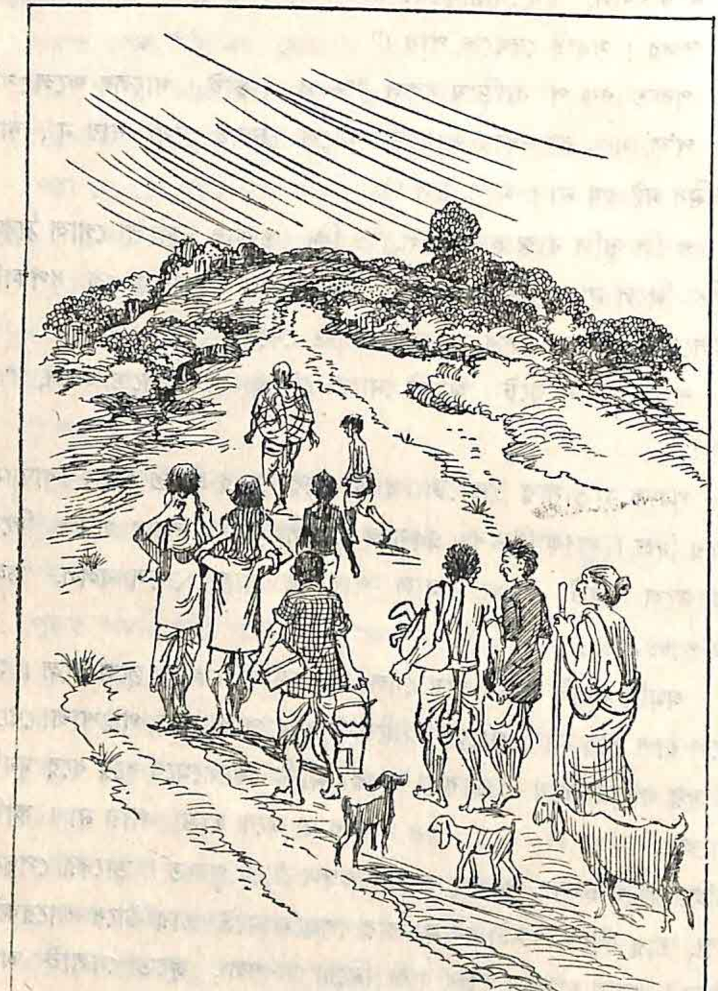
শম্ভুর বোন দুটো অমনি নোংরা নোংরা হাত পেতে বলল, "দে লে!"

পুরুত বাতাসার কৌটো খালি করে সবার হাতে হাতে বাতাসা দিয়ে দিল। ধূপকাঠি সব একসঙ্গে জ্বেলে মাটির দলায় গুঁজে দিয়ে, গঙ্গাজলে সবটি কালো গোল পাথরের গায়ে ঢেলে বলল, "চল, তা হলে।"

অমনি সবাই রওনা হয়ে গেল, বড় বড় পা ফেলে, দুলে দুলে। তা হলে হাঁপ ধরে না। আরো এগিয়ে, যতদূর পারা যায়, পাঠশালা থেকে যতদূর যাওয়া যায়। ছোকরা বাবুরা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে ধরে মুনসি পালের পাঠশালে ভরে দেয়। আর এ জন্মে ছাড়া পায় না। কালি ভুলি আগে চলল, তাদের আগে কম্বল কাঁধে পুরুত। তাদের পেছনে শম্ভু, তার কাঁধে একটা বোন, তার পেছনে নটে, তার কাঁধে আরেকটা বোন। সবার পেছনে উনুন-বাক্স নিয়ে চা-ওলা, জুতো-সেলাই আর কাঠ-গুদামের বেকার লোকটা। পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে, কথায় কথায় পথ পার হয়ে যায়।

ওরা অবাক হয়ে দেখে কি না শহর ছেড়ে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই অমনি পাড়া-গাঁ। দু দিকে ধানক্ষেত। মধ্যিখানে সড়ক। এ দিকের

ধানক্ষেত থেকে ওদিকের ধানক্ষেতে জল যাবার নালা, তার ওপর ছোট্ট পুল। পুলের উপর একটা মা-ছাগল আর দুটো ছাগলছানা নিয়ে এক বুড়ি বসে। বুড়ির চোখে জল। সে সব কথা শুনে বলল, 'আমিও



যাব। নইলে ছেলেপুলেদের ছাগল-দুধ কে খাওয়াবে? তাছাড়া বৌ ঠ্যাঙার বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবটাই বা কোন্ চুলোয়?"

পুরুত বলল, "তবে চল।"

কিছুদূর গিয়ে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, "তা যাওয়া হচ্ছেটা কোথায় ?

ওরা বলল, "যেখানে তিনটে জিনিস পাওয়া যায়।"

"কোন্ তিনটে জিনিস ?"

ওরা বলল, "থাকার চালা, পেটের খাবার, পরনের কাপড়।"

শুনে বুড়ির কি হাসি, "দুৎ! অমন জায়গা আছে নাকি আবার ?"

"আছে, আছে, চল আমাদের সঙ্গে।"

"সে কোথায় ? সত্যি ও-সব সগ্‌গ ছাড়া কোথাও আছে নাকি ?"

পুরুত বলল, "আছে। যা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না সেই সব সেখানে আছে। আলো, বাতাস, জল, ফল, শকর-কন্দ।"

বুড়ি বলল, "চল তাহলে। কিন্তু তেড়িয়ে দেবে না তো ?"

"কেউ নেই তো তাড়াবেটা কে? সে আমার বুড়ো ঠাকুরদাদের স্বপ্ন দেখার দেশ। তবে কিছু কাঁকড়াবিছের উৎপাত আছে, তাই ওমিওপ্যাথির শিশিটে নিয়েছি।"

বেকার লোকটা বলল, "তাছাড়া গাঁদা ফুলের পাতা বেটে মাখিয়ে দিলে সব দুঃখু দূর হয়।"

জুতো-সেলাইও কম যায় না, সে বলল, "হাড়-ভাঙা পাতা ছেঁচে লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়।"

"সে সবই সেখানে গাছতলায় গজায়। ঠাকুরদাদারা যেমন সব ফেলে এসেছিল, তেমনি আছে।"

সারাদিন ওরা হাঁটল। দুপুরে গাবতলায় থেমে পেট ভরে গাব খেল। সন্ধ্যা নাগাদ বুড়ো ঠাকুরদারদের স্বপ্নে দেখা সেই জায়গায় পৌঁছল।

জায়গা তো নয়, একটা পাহাড়। পাহাড়ও নয়, বরং একটা উঁচু ঢিপি। আগাগোড়া ঘন বনে ঢাকা। বনের তলা দিয়ে শুকনো পাতা বিছানো অনেক দিন না-চলা এক পথ। তাই দিয়ে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে দেখে যেন সত্যি সগ্‌গে এসেছে। তাহালে বুড়ি তো ঠিকই বলেছিল।

খালি সবুজ গাছ আর লতা আর ফুলের গন্ধ আর থোপা থোপা

পাকা ফল রসে টুপ-টুপ করছে। ছোট ছোট ঝরনা মাটি থেকে বুগ-বুগ করে উঠে কুল-কুল করে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে। তারই ধারে ধারে বড় বড় পাথরে ঝরঝরে সব গুহা, পায়ের নিচে বালি, দেয়ালে কারা গেরি মাটি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে, হরিণ ছুটছে, শিকারী ধনুক তুলেছে, বাজ পাখি উড়ছে।

চারদিক চেয়ে চেয়ে ওরা অবাক। "কারা এমন ভালো জায়গা ছেড়ে চলে গেছিল, পুরুত? কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, আঁস্তাকুড় নেই দেখেছ!"

পুরুত বলল, "যারা গেছিল তারা আমার ঠাকুরদাদের ঠাকুরদারা। তারা গেলে ময়লা করবেটা কে শুনি? জন্তুজানোয়ার কখনো পরিষ্কার মাটি নোংরা করে?"

বুড়ি চেয়ে চেয়ে বলল, "ওমা, লাল ধানের চাষ করেছিল গো। আম জাম কাঁঠাল কলা পুঁতেছিল। তুলো গাছ লাগিয়ে ছিল। গোরু ছাগল পেলেছিল! চারদিকে তার চিহ্ন পাচ্ছি। তা ছেড়ে গেল কেন?"

পুরুত অন্যমনস্কভাবে বলল, "আর থেকে হবেটা কি আমার মাথা-মুণ্ডু! খেতে পেল, শুতে পেল, পরতে পেল; তাই শেষটা টিকতে না পেরে চলেও গেল।"

কালি ভুলি নটে শম্ভু শুনে অবাক। বোন দুটো ঘুমিয়ে কাদা। ছাগল তিনটে শেষ এক কোশ এর ওর কাঁধে চেপে এসেছিল, শুধু তারাই চুপ করে রইল।

তখন বাকিরা উঠে পড়ে মহা শোরগোল তুলল, "তবে আমরাই বা টিকব কেমনে? আমরাও ফিরে যাই। পুরুত, তুমি ঠাকুর ফেলে এসে ভালো করনি। এখানে আমাদের দেখবে কে?"

নটে বলল, "বলেছিলে যে এখানকার বনে ঠাকুর হাঁটে, কোথায় সে?"

অমনি কোথা থেকে এক দমকা বাতাস উঠতেই, সারা বন শির-শির সর-সর করে উঠল, ফুলের গন্ধে চারদিক ভরল, ঘুমের ঘোরে

পাখিরা বলল কুঁ-কুঁ বকম-বকম। সারা রাত জেগে পাখার বাতাস দিয়ে মৌমাছিরা মৌচাক ঠাণ্ডা করে, তারা বলল গুণ্ণ্ণ্ গুণ্ণ্ণ্। টুপ-টাপ করে ছুটো চারটে ফুল-ফল ঝরে ওদের গায়ে প'ল, গাছে গাছে জোনাকি জ্বলল।

আর কারো মুখে কথা নেই। বুড়ি চা-ওলার টিনে ছাগল ছুইয়ে ওদের ছুধ খাওয়াল, তারপর ফল খেয়ে, নদীতে মুখ হাত ধুয়ে, গুহার বালিতে পাতা পেড়ে যে-যার সে রাতের মতো ঘুমিয়ে রইল।

সকালে পুরুত বলল, "স্নান করে সব সাফ হ। বনের গাছতলা তকতক করছে, পাতায় পাতায় কে যেন পালিশ লাগিয়েছে। বেকার যুবক, তুমি কাঠ চিরে তাঁত আর চরকা বানাবে; জুতো-সেলাই, তুমি কার্পাস তুলে সুতো কাটবে; বাকিরা কাপড়-বুনবে। সবাই মিলে ধান তুলবে, শস্য তুলবে। সবাই গুহায় শোবে। আবার কি চাই?"

ওরা লাফিয়ে উঠে বলল, "কিছু না, কিছু না, পাঠশাল নেই, কি মজা, কি মজা।"

ওরা স্নান সেরে এলে পুরুত বলল, "কিন্তু সবার আগে একটা কথা।" বলে কাঠি দিয়ে মাটিতে একটা বাঁকা দাগের পাশে, একটা দো-ঠেঙো সোজা দাগ কেটে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি?"

কালি বলল, "উল্টে পড়া কচ্ছপের ছানা, পাশে একটা ঘাস।"

ভুলি বলল, "উল্টোনো অসের হাঁড়ি, পাশে পেঁপের বোটা।"

শম্ভু বলল, "গুগলীর পাশে ঘাস।"

পুরুত একটু কি যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা, ঐটেকে তোরা কাঠি দিয়ে আঁক।"

সারি সারি আঁকা হলে, পুরুত বলল, "আচ্ছা, ওর পাশে আরেকটা ফ্যাকড়া কাঠি দে দিকি; ঠেকা দিয়ে থাকুক।"

তাই আঁকল ওরা। নটে অনেকগুলো আঁকল।

তারপর পুরুত বলল, "দেখ্‌গে বারো মেসে আমগাছে আম হল কিনা। আবার কাল নক্সা আঁকা। সাপের পরিবার।"

ওরা চলে গেলে বুড়ি এসে অনেক দেখে শুনে বলল, "ও পুরুত, নেকা-পড়া নয়তো ?"

পুরুত বলল, "ওগুলো তাই কখনো করে ? ঐ দিয়ে ওদের অস্তর হবে। দাও, আমাকে নারকেলের মালা করে ছাগলের ত্বধ দাও।"

বন-বেড়ালের ছাঁ

দাত্বর কাণ্ড দেখে তিন্নি-মুন্নি অবাক। এই রোজ রোজ ওদের বন-জঙ্গলের গল্প বলে, বাপি কেমন বাংলা দেশের বড় যুদ্ধে নিখোঁজ হয়ে তাঁবার মেটেল পেয়েছিল দেখায়, বুড়ি কুসুমদিদিকে বলে, "ওদের রোজ সকালে ভুট্টা সেদ্ধ করে ছাগলের ত্বধ আর মধু দিয়ে খেতে দিও। হাড্ডি শক্ত হবে, শরীরে তাগৎ হবে। গরীব-ত্বঃখীর দিন আসছে, এখন ত্বলা হবার সময় নাকি ?" আর এখন নেই তো নেই ! একটা চিঠি পর্যন্ত নেই !

দাত্ব হল বাপির দাত্ব, পঁচানব্বুই বছর বয়স। আজ ত্ব বছর বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে খালি খালি ওদের বলে, "মুখ্যু হলে চলবে কেন ? অ-আ লিখতে পড়তে শেখ্, নিজের নাম লেখ্, আঁক কষ্, কই পাঠশালের বইগুলো এনে জোরে জোরে পড়ে শোনা দেখি।"

ওরা দোরগোড়ায় পাশাপাশি বসে স্থর করে পড়ে। দাত্ব বেজায় খুশী হয়ে বলে, "হ্যাঁ, এই ঠিক। আমার দাত্ব যদি আমাকে লিখতে পড়তে শেখাত তবে কি আমি বনে বনে চৌকিদারি করে দিন কাটাতাম ! দেয়ালের গোঁজে তক্তা ফেলে খাট বানিয়ে বুড়ো হাড় জিরোতাম ? আমি মুন্সী হতাম, নেয়ারের খাটে ঘুমোতাম, কেরোসিনের লম্প জ্বেলে রাতে রামায়ণ পড়তাম। কই বাটির নিচে

একটু করে দুধ-মকাই রাখা হল কার জন্য ? এক দানা খাবার নষ্ট করতে হয় না, তা জানিস ?"

ওরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, "বন থেকে রোজ দুটো বিল্লি-বাচ্চা আসে দাদু, তারা বড্ড রোগা, তাদের দিই।" দাদু কি ভেবে বলল, "তা দিস। কিন্তু তাই বলে বাটি চাটাস না। ওদের দাঁতে বিষ।" শুনে হাসি পেয়েছিল। কি যে বলে দাদু—দাঁতে বিষ। কড়ির মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত মুন্টু মিনির, কিন্তু কি ধারালো, বাপ ! এক কামড়ে বটের-পাখির ডানা ছিঁড়ে খায়। কিন্তু কোথায় পাবে রোজ রোজ বটের ? কোথায় চকচকে চেকনাই গা হবে, তা না, হাড়গুলো উঁচু উঁচু হয়ে থাকে। তিন্নি মুন্না শালপাতায় করে ওদের দুধ মকাই খেতে দেয়। বড় পাথরের আড়ালে ; মুন্টু মিনির বড় ভয়। কুসুম-দিদিকে পাক-ঘরের দরজায় একবার দেখেছে কি না দেখেছে, অমনি চোঁ-চাঁ দৌড়। ভারি ভীতু বনের বিল্লি। কিন্তু কি মিষ্টি দেখতে। ঘি রঙের গা, তাতে একটু একটু দাগ, গুর-র গুর-র করে ডাকে, ওদের কোল বেয়ে উঠে খড়খড়ে জিব দিয়ে গাল চেটে দেয়। তিন্নি মুন্না আহ্লাদে গলে যায়। রোজ ওরা খেতে আসে। খাওয়া হলে গড়াগড়ি খেলে। এতটুকু শব্দ শুনলে হাওয়া।

এর মধ্যে দাদু এই কাণ্ড করল। রবিবারের ছুটি, পোস্টমাস্টার মশাই দেখতে এসেছেন। দাদু তিন্নি মুন্নাকে ডেকে পাঠাল। মুন্টু মিনি তখনো খায়নি, কাঠের গাদার পেছনে বাটি লুকিয়ে রেখে আসতে হল। কুসুমদিদি দেখতে পেলে তো ধুয়ে-টুয়ে সারা। ব্যস্, হয়ে গেল মুন্টু মিনির খাওয়া।

দাদু ওদের দেখিয়ে বলল, "মনে থাকে যেন মাস্টার মশাই, এরাই আমার ওয়ারিশ ; আর তো কিছু নেই, শুধু ঐ যে আপনি বীমা করিয়েছিলেন ওদের বাপ জন্মাবার সময়, ঐ টাকাটি পাবে আর ওদের বাপের পেনসিলটা পাবে। ওতেই ওরা মানুষ হয়ে যাবে, কি বলেন ?" দাদু ব্যস্ত হয়ে মাস্টার মশাইয়ের দিকে তাকাল। মাস্টার মশাই বললেন, "তুমি নিশ্চন্ত থাক, ঠাকুরদা, ওদের নামে

লেখাপড়া করে, তোমার টিপ-সই নিয়েছি না। পিওনরা তুজন সাক্ষী আছে। আর তুমিই বা অত বেজার হচ্ছ কেন বল তো ? পঁচানব্বুই বছর কাটালে আর দশটা বছর বাঁচবে না ? তদ্দিনে তিন্নির গোঁপ বেরুবে।"

শুনে তিন্নি খুশী হয়ে গোঁপের জায়গায় আঙুল বুলিয়ে বলল, "দাত্ন, তোমার তীর-ধনুকটা আমি নেব কিন্তু। কড়িচাচা যেন হাত না দেয়।"

দাতু মাস্টার মশাইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "ঐ আর এক কথা। আমার ছোট ছেলে তুকড়ি, পাজির পা-ঝাড়া, সে তো জানেনই ঐ বীমার টাকা হাতাবার জন্য ও কি না করতে পারে। ও কুস্থম-মা তুকড়িকে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিবি নে। কুস্থম ওদের দেখাশুনা করবে লিখে নিয়েছেন, মাস্টার ?"

মাস্টার মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। "কিচ্ছু ভেবো না ঠাকুরদা. আমি দেখব যেন ওদের কোনো কষ্ট না হয়। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।"

তাই শুনে দাতু খুশী হয়ে হাসতে গিয়ে চোখ বুজে কাঠ হয়ে রইল। কুস্থমদিদি কেঁদে উঠল। মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পিওন ছিল। তার নাম হরিদাদা। হরিদাদা হাসপাতালের ডাক্তারকে নিয়ে এল। মাস্টার মশাই বললেন, "ও তিন্নি মুন্না, তোমরা আমার সঙ্গে চল, হরিণছানা এনেছি, পুষব বলে।"

তিন্নি বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

মুন্না ফিসফিস করে বলল, "আমি ওদের খাইয়ে এসেছি। পাক-ঘরের দরজার কাছে এসেছিল, এমনি তুষ্টু !"

সারাদিন ওরা হরিণছানা নিয়ে খেলেছিল। তুপুরে মাস্টার মহাশয়ের বৌ ওদের গাওয়া ঘি দিয়ে কাঁচকলা ভাতে ভাত মেখে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে দাতু নেই, দাতুর খাট-বিছানা নেই, খালি কুস্থমদিদি একলা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। নাকি দাতু স্বর্গে চলে গেছে। দাতুর আক্কেল দেখে ওরা তুজন

অবাক হল! বলা নেই কওয়া নেই অমনি স্বর্গে গেল! আর ঐ ছেঁড়া নোংরা বিছানা বালিশ নিয়ে! এক দিন পরে গেলেই হত, কুসুম কেচে দিত। সে-কথা বলতেই কুসুমদিদি মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল, তাই ওদের থামতে হল।

ক'দিন পাঠশালা যাওয়া বন্ধ রইল। বাড়িতে দূর দূর থেকে কত লোক এল। সবাই বলে ছুকড়ি আসেনি? না, ছুকড়ি কোথায় কেউ জানে না। বাপের জন্য কোন কালেই বা কি করল সে? দাতুর পেনসিল, বাপির পেনসিল, তাই দিয়ে কোনোমতে চালিয়েছে কুসুম-দিদি। এই প্রথম শুনল তিন্নি মুন্না যে কুসুমদিদি নাকি দাতুর বোনের নাতনী; বনের ধারে ছোট্ট বাড়িটা নাকি তার, নিজের বাপের কাছ থেকে পাওয়া। সবাই বলল, 'এবার টাকার গন্ধ পেয়ে ছুকড়ি এসে হাজির হবে দেখো।' কুসুমদিদি বলল, "কাঁচকলাও পাবে না; আসুক না। আমার বাড়িটাও পরে তিন্নি মুন্না পাবে। হুঃ!"

রোজ সকালে মুনু মিনি এসে খেয়ে যেত। দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠেছিল ওরা। দাঁড়াত যেন তিন্নি মুন্নার কাঁধ অবধি। এত বড় বন-বেড়াল দেখাক তো কেউ! ছুধ মকাই না খেলে এমন হত না। গায়ে কেমন দিনে দিনে রঙও ধরেছে। 'কি সুন্দর রে তোরা!' তিন্নি মুন্না ওদের পেটে মাথা ঘষে দিত, ওরা কিং জোরে গু-র-র, গু-র-র করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত। তারপর যেই তিন্নি মুন্না উঠে পড়ত, ওরাও শাঁ করে বনের মধ্যে মিলিয়ে যেত।

কুসুমদিদি বড় ভালো। ওদের খুব যত্ন করত। ওর ভারি ভয় কড়িচাচা না এসে গোলমাল করে। তিন্নি সাহস দিয়ে বলত, "কিচ্ছু ভয় নেই, কুসুমদিদি, আমি দাতুর তীর-ধনুক দিয়ে না, দড়াম করে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।" মুন্না বলল, "সেবার তোমার হাত মুচকে দিয়েছিল, তুমি কেঁদেছিলে। কুসুমদিদি চুন-হলুদ দিয়ে বেঁধে না দিলে, হাতটা খোঁড়া হয়ে যেত; দাতু বলেছিল।"

তারপর তুজনে কুসুমদিদিকে বলল, "দাতু কবে ফিরে আসবে? একলা একলা ভালো লাগে না!" সত্যি ভালো লাগত না। ভাগ্যিস

মুন্থ মিনি রোজ আসত। আজকাল আবার সন্ধ্যেবেলা আসা ধরেছিল। কুসুমদিদি পাকঘরে চাপাটি করত, ওরা বনের ধারে সবজি বাগানে জল দিত। ঠিক তখন দেখতে পেত বড় পাথরের পাশ দিয়ে দুটো মিষ্টি হলুদ-পানা মুখ বেরুচ্ছে। কতটুকু আর দুধ-মকাই, গপ্ করে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলে, ল্যাজ নেড়ে, গড়াগড়ি করে, ওদের চেটে-চুটে একাকার। যেই না কুসুমদিদি ডাক দিত, "কোথায় গেলি তোরা? রুটি তৈরি!" অমনি দুটোতে হাওয়া হয়ে যেত। যেমনি বড় বন-বেড়াল, তেমনি চালাক।

এমনি করে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল। তারপর একদিন যা হবার তাই হল। কড়িচাচা এসে উপস্থিত। এসেই সে কি তার রাগ-মাগ! ওরা দুজনে পাঠশালা থেকে এসে কুসুমদিদির চিঁড়ে কোটায় সাহায্য করছে, এমন সময় দাপাতে দাপাতে এসে উপস্থিত। কোথায় শুনেছে দাদু নাকি মরে গেছে। ওর কথা শুনে তিন্নি মুন্না অবাক। ভয়-ভয়ও করছিল, মানুষ তো নয় যেন একটা ডাকাত। কি সব খারাপ খারাপ কথা কড়িচাচার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল। কুসুমদিদি কানে হাত দিল। তিন্নি বলল "তুমি বড্ড দুষ্টু। আমি তোমাকে দাদুর তীর-ধনুক দিয়ে মেরে ফেলব।" তাই শুনে চোখ লাল করে কড়িচাচা তিন্নির মাথায় এমনি জোরে গাঁটা মারল যে চামড়া ফেটে চোখে কপালে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। একটা চাপা শব্দ করে তিন্নি মুন্না পাক-ঘর দিয়ে পালাল। দুধের কড়া উল্টে ফেলে দিয়ে কড়িচাচা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। "আমাকে বাদ দিয়ে ওদের টাকা দেওয়া, দেখে নেব!"

ওদের পা কাঁপছিল, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল, পেট কামড়াচ্ছিল। সবজি-বাগানের মাঝখানে দুজনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঘরে তখনো কি চ্যাঁচামেচি। হঠাৎ মুখ তুলে মুন্না বলল, "তাহালে মুন্থ মিনি কি খাবে? ও যে সব দুধ ফেলে দিয়েছে?" তিন্নি উঠে বলল, "গরীব-দুঃখীদের দিন আসছে। দুবলা হলে চলবে না, দাদু বলেছে। কেন, ওদের দুটো করে রুটি দেব। অত বড় বড় দাঁত আছে না, চিবিয়ে খাবে।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কুসুমদিদি ডুকরে কেঁদে উঠল, দা হাতে কড়িচাচা ঝড়ের মতো ছুটে এল ; তিন্নি মুন্না দু হাতে মুখ চেপে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পালাবার কথা মনে হল না। তিন্নির কাঁধ ধরে



কড়িচাচা তাকে টানতে টানতে বনের দিকে নিয়ে চলল। মুন্নার গলা দিয়ে সে কি করুণ কান্নার মতো একটা শব্দ বেরুল আর সঙ্গে সঙ্গে বড় পাথরের পিছন থেকে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো প্রকাণ্ড দুই মূর্তি বেরিয়ে এসে নিমেষের মধ্যে কড়িচাচার মাথায় এক চাঁটি মেরে এক

ঝলক আলোর মতো বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কড়িচাচা পড়ে রইল। কুসুমদিদির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। উঠি-পড়ি করে কোনোমতে এসে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল। গলা দিয়ে শুধু অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল, "বাঘ! বাঘ!" মুন্না ফিক করে হেসে বলল, "দুৎ! বাঘ কোথায়, ও তো মুনু মিনি, আমাদের বন-বেড়াল! ওদের আমরা রোজ দুধ-মকাই খাওয়াই!"

কুসুমদিদি বলল, "আ সব্বনাশ!" বলে মুচ্ছো গেল। ততক্ষণে চ্যাচামেচি শুনে গাঁ থেকে অনেক লোকজন এসে গেছিল, ব্যাপার শুনে সবাই হাঁ।

পোস্টমাস্টার বললেন, "নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগেই বলেছিলেন যে সংরক্ষিত বনের এদিকের দেয়াল বড্ড নিচু। সত্যি যদি বাঘ হয়ে থাকে, তবে দেয়াল টপকে এসেছে।"

তিন্নি মুন্না তবু বলতে লাগল, "না, না, আমাদের বন-বেড়াল।"

"কিন্তু বন-বেড়াল কখনো এক চাঁটিতে কারো ঘাড় মটকাতে পারে? কে জানে, পারে হয়তো!"

মুনু মিনি আর আসেনি। ঐ দেয়াল নাকি উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল। তিন্নি বলল, "ভালোই হল রে মুন্না, ওদের যদি থানায় ধরে নিয়ে যেত!"

একটা সুখের কথা বলতে বাকি ছিল। সেটি হল যে এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিন্নি মুন্নার নিখোঁজ বাবা ফিরে এসেছিল। খুব জখম হয়ে এতদিন সে কোন গাঁয়ের হাসপাতালে পড়েছিল। তারপর গরীব-দুঃখী কজনার দুঃখ কমল।

খিদে

রাতে আকাশটা ভারি অদ্ভুত দেখতে হয়ে যেত, বিশেষ করে যেদিন চাঁদ থাকত না। নিচু, ঘন বেগনী আর এই বড় বড় লক্ষ লক্ষ তারা। সেই তারার আলোতে চারদিক আলো হয়ে থাকত, সে আলো সূর্যের মতো সোনালীও নয়, চাঁদের মতো রুপোলীও নয়, সে-আলোর কোনো রঙই ছিল না, অথচ সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যেত। সে রকম আকাশ আমাদের দেখবার কথা ছিল না; তার অনেক আগে আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা। তবু মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি 'আঁক্-আঁক্-আঁক্' বলতে বলতে উড়ে যেত, গরম বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে, জানলার মোটা পরদা সরিয়ে ঐ আকাশ দেখতে পেতাম। ভাবতাম পাখি 'আঁক্-আঁক্' বললে কি হবে, যার রঙ নেই, তাকে আঁকি কেমন করে?

খাটের পায়ের কাছে, পুরু মাদুরের ওপর মাথা থেকে পা অবধি কম্বল মুড়ি দিয়ে উবিনের মা শুয়ে থাকত, সে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। সে বলত, "নেহাত আমার উবিন ফ্রাং চলে গিয়ে, মেম বিয়ে করে সেখানে মিলিংটারীতে কাজ করে, তাই আমি রাতে তোমাদের বাড়িতে পড়ে থাকি। বিদেশীদের কাছে থাকতে হয় না, তারা লোক ভালো নয়।" শুনে আমাদের খুব দুঃখ হত। উবিনের মা গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে আমাদের হাত-পা মুছিয়ে দিত আর বলত, "তোমাদের চোখে জল দেখছি কেন? চোখে জল থাকলে রাতের খুদে পরীদের দেখা যায় না।" শুনে আমরা অবাক।

জানলার পরদা সরাতেই উবিনের মা জেগে উঠে বলত, "কি দেখেছ? কাচের বাসনে দুধ-কমলা গুলে বাইরে রাখতে হয়, তবে তো তারা খিদে তেষ্টা মেটাতে আসবে, তবে না তাদের দেখতে পাবে।" চেয়ে দেখতাম বাইরে সব নিঝুম চুপচাপ, কেউ কোত্থাও নেই। কিচ্ছু

না বলে আবার এসে শুয়ে পড়তাম। উবিনের মা আবার মাথা মুখ ঢাকতে ঢাকতে বলত, "আর উঠোটুঠো না, বুঝলে? অমনি আমি শুনতে পাব। আমি বনের মেয়ে, এক কান খুলে রেখে তবে ঘুমোই।"

কত রকম ছোট ছোট জানোয়ার দেখতাম, কিন্তু পরী দেখা আর হত না। অথচ আমাদের স্কুলের মেম-দিদিমণি একদিন বলে বসলেন, "আমাদের দেশে কি বলে, জান? সকালে উঠে মাঠের মধ্যে যখনি দেখবে গোল হয়ে এক সারি ব্যাঙের ছাতা বেরিয়েছে, অমনি বুঝতে হবে রাতের পরীরা ঐখানে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নেচেছে। তেমন কান থাকলে ওদের গানও শোনা যায়।" আমরা কত চেষ্টা করতাম কিন্তু কিছুই শুনতে পেতাম না, শুধু মনে হত কানের মধ্যে কি যেন ঝম্-ঝম্ করছে, দাদা বলত ঐ নাকি আমাদের শিরার মধ্যে রক্ত চলার শব্দ।

একদিন গোল হয়ে গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার সারি দেখলাম। মধ্যিখানে একটা শুকনো ব্যাঙের ছাতা আর তাকে ঘিরে এক সারি ছোট ছোট ব্যাঙের ছাতা গোল হয়ে ঘুরে এসেছে, ফিকে গোলাপী, ফিকে হলুদ, ফিকে বেগ্নী, সে যে কি সুন্দর সে আর কি বলব। ঐ নাকি রাতের পরীদের পায়ের চিহ্ন। মেম বলেছিল তারা নাকি দেখতে বড় বিশ্রী, রোগা হাড়-জিরজিরে, এই লম্বা নাক, ছুঁচলো কান, বিলবিলে চোখ, খিটখিটে মেজাজ, কিন্তু ওদের মন নাকি বড় ভালো, যাদের ওপর খুশী হয় তাদের জন্য কি না করে। আর যারা দুষ্ট হয়, তাদের ওরা শাপ দেয়, তাই তারা তোতলা হয়ে যায়, ভুলভাল কথা বলে, পড়া বলতে পারে না। তবে এমনি এমনি আসে না তারা, দুধ-কমলা রাখতে হয়, পরিষ্কার কাচের বাটিতে করে।

খুদে খুদে কত জানোয়ারই তো দেখতাম, পাথরের তলায় গর্তের মধ্যে মেঠো ইঁদুর। ঘরে চিমনিতে আগুন জ্বলত, বাইরে তার পাথরগুলো একটু একটু তেতে উঠত, তারই খাঁজে কালো গিরিগিটি আগুনের আঁচ পোয়াত। একবার দেখেছিলাম এক ঝাঁক মৌমাছি গুনগুন করতে করতে জীবন রায়ের কমলা বাগানে ঢুকে গেল। ছোট

পাহাড়ী নদীতে কাচের মতো স্বচ্ছ খুদে খুদে মাছ দেখতাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রাতের পরীদের দেখা পাইনি। মা-ও কিছুতেই কাচের বাটি করে দুধ-কমলা বাইরে রাখতে চাইতেন না। বলতেন, "কুলপি চাস বুঝি ? ওতে কুল্‌পি হবে না আরো কিছু, কুল্‌পি করতে হলে নুন-বরফে পাক দিতে হয়।"

শীত পড়ে এল একবার, কিছুদিন পরেই স্কুল ছুটি হবে, গাছ থেকে পাতা খসতে শুরু করেছে। আমাদের স্কুলে সন্ধ্যেবেলায় নাচ-গান হল, ফিরতে ফিরতে সব রাত হয়ে গেল। তখন মাথার ওপর তাকিয়ে দেখেছিলাম আকাশ কত নেমে এসেছে, গাঢ় বেগ্‌নী রঙ, লক্ষ লক্ষ তারা, তারার আলোয় চারদিক আলো আর ঠাণ্ডা শুকনো বাতাস গাছের পাতার মধ্যে সর-সর করছে। উঁচু দিয়ে রাস্তা, রাস্তার অনেক নিচে বড় বড় গাছের গোড়া, গাছের মগ-ডাল রাস্তার সমান সমান। সেইখানে শুনি মহা সোরগোল, চ্যাঁচা-চ্যাঁচা কিচ্‌-কিচ্‌।

কি ব্যাপার ? না, কাঠবেড়ালির বাসায় শীতের খাবার মজুত আছে, তারই লোভে ভাম উঠেছে মগ-ডালে। গাছের যত কাঠ-বেড়ালি সবাই পেল্লায় চ্যাঁচাচ্ছে। ভাম তাদের পাঁচগুণ বড়, দাঁত খিঁচিয়ে, নখ বাগিয়ে, বিকট চেহারা করে রয়েছে। দেখে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা।

দাদার হাতের টিপ ভালো, লেকের জলে ঢিল ছুঁড়ে ব্যাঙ লাফাত। দাদা অমনি একটা পাথর কুড়িয়ে ভামের গায়ে ছুঁড়ে মারল। থপ্‌ করে একটা শব্দ হল, ভামের গায়ে ঢিল লাগল, অদ্ভুত একটা শব্দ করে ভাম ফিরে তাকাল। তারার আলোয় তার লাল চোখ পর্যন্ত দেখা গেল, তার পরেই পড়ি-মড়ি খচ-মচ করে গাছ বেয়ে ভাম নেমে গেল। কাঠবেড়ালিরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

শীত পড়লে, বিছানায় ঢুকেই মনে হয় বিছানা বুঝি ভিজে সপসপ করছে। তারপর গায়ের গরমে গরম হলে আরাম লাগে, ঘুম আসে। ঘুমের মধ্যেও ভামের সেই লাল চোখ, সামনের দুটো চকচকে দাঁত দেখতে পেলাম।

ও-সব দেশে ঝপ্ করে শীত পড়ে। পাঁচটা বাজার আগেই সূর্য পাহাড়ের পিছনে আড়াল হয়ে যায়, কিছুক্ষণ একটা লালচে আলো চারদিকে ছেয়ে থাকে, তার পরেই অন্ধকার। অমনি হু-হু করে ঠাণ্ডা



বাতাস বইতে থাকে। মানুষ, পাখি, জন্তু জানোয়ার কেউ আর বাইরে থাকে না। আমাদের স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধুরা অনেকে পাহাড়ের নিচে মামার বাড়ি, দিদির বাড়ি চলে গেল। শীত তাদের সহ্য হয় না।

দুধ সস্তা হয়ে গেল, এই বড় বড় কমলা উঠল। মা একদিন হেসে বললেন, "এবার তোদের দুধ-কমলা বাইরে রাখা যাবে। কুলপি হবে না, তবে ওপরে এক পরত বরফ জমবে। তাই বা মন্দ কি।"

রেখেছিলেন মা সত্যি-সত্যি দুধ-কমলা, একটা এলুমিনিয়মের পাত্রে নীল রঙের জালের ঢাকনি দিয়ে। পায়রাদের কাঠের খোপের চালের ওপর। খোপ খালি ছিল, দুষ্টু চিল এসে দুটো পায়রার চোখ খুবলে খাবার পর, দাদা বাকিগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা সারাদিন কোথায় বনে বনে উড়ে বেড়িয়ে, সন্ধ্যার আগে বারান্দার ঝুলো ছাদের নিচের ঘুলঘুলিতে রাত কাটাত। আমরা ঘুমের ঘোরে তাদের বক্-বকম্ শুনতে পেতাম। পায়রার খোপ খালি পড়ে থাকত।

স্নানের ঘরের জানলা থেকে পায়রার খোপ দেখা যেত। ঠিক করেছিলাম রাতে উঠে দেখব। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে শুনলাম রাতে কে যেন এলুমিনিয়মেয় পাত্র নিচে ফেলেছে, দুধ-কমলার গঙ্গা মাটিতে জমে বরফ হয়ে আছে। তবে সে খাওয়া যায় না। নিশ্চয় কালু বেড়ালের কাজ। দিদি, আমি একটু কেঁদেছিলাম, বাটি নিচে পড়ে দুধ-কমলা নষ্ট হল ; রাত-পরীরা খেতে পেল না। উবিনের মা সেদিন রাতে আমাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "কেউ ফেলেনি, ওরাই রেগেমেগে ফেলে দিয়েছে। কাচের বাসনে রাখতে হয়।" আমরা উঠে বসতেই উবিনের মা বলল, "আহা, আবার উঠছ কেন ? আজ বাড়তি দুধে কমলা দিয়ে, হাতল-ভাঙা পেয়ালাতে করে, আমি নিজে রেখে এসেছি। ঢাকা দিতে হয় না, ওরা শুঁয়োপানা হাত দিয়ে ঢাকা তুলবে কি করে ?"

কিন্তু রাত-জাগা আমাদের হল না, যেমন শোয়া, তেমনি ঘুম। সকালে চকচকে চোখে দিদি আমাকে জাগিয়ে বলল, 'পেয়ালা চাঁচা-পোঁছা, কখন এসে ওরা খেয়ে গেছে।' ইস্, এল অথচ দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম পায়রা-খোপের পায়ের কাছে ছোট ছোট দাগ, যেন খুদে খুদে পায়ের ছাপ। তবে কি উড়ে আসেনি, পায়ে হেঁটে এসেছিল ?

তার পরদিন উবিনের মাকে অনেক বলে-কয়ে আবার দুধ-কমলা রাখা হল। সে খুশী হয়েই রাখল, বলল, "তা তোমাদের মা রাগ করতে পারে, কিন্তু দশ বছর ফ্রাংএ থেকে, তারপর আমার উবিন যদি ফিরে এসে বলে—মা, তোমাকে নিতে এসেছি—সেই বা মন্দ কি ?" এই বলে চোখ মুছে উবিনের মা গা-মাথা মুড়ে, পাশ ফিরে শুল। দিদি, আমি স্নানের ঘরের বন্ধ জানলার চৌকাঠে চড়ে বসে রইলাম।

অনেক রাতে তারা সত্যি এল। দিদির কাঁধে মাথা রেখে আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। দিদি ঠেলে জাগিয়ে দিল। তারার আলোয় দেখলাম সবার আগে লম্বাটে মতো কালো একটা কি খুঁড়িয়ে চলেছে, পিছন পিছন খুদে খুদে তিনটে ছানা, কখনো ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে, কখনো ফিরছে। বড়টার সামনের একটা পা খারাপ, তুলে রেখেছে। তবু নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে ছানাদের খোপের ওপরে তুলল। তারপর তারা কচি কচি মুখ তুলে ইদিক উদিক তাকিয়ে হাতল-ভাঙা পেয়ালায় মুখ ডোবাল। বড়টা দেখতে লাগল। ওদের খাওয়া হলে, কিছুই বোধ হয় বাকি রইল না, বড়টা পেয়ালা কাত করে তার গা চাটল।

ন্যাসপাতি গাছের কোটর থেকে চ্যা-চ্যা করে লক্ষ্মী প্যাঁচা ডেকে উঠতেই বাচ্চগুলোকে জড়ো করে, নিমেষের মধ্যে বড়টা গিয়ে খোপে ঢুকল। তারপর কখন নেমে গিয়ে থাকবে, সকালে কাউকে দেখা গেল না।

জানলা থেকে নেমে আমি বললাম, "ওরা তো ভাম, দাদা ঢিল ছুঁড়ে বড়টার পা ছেঁচে দিয়েছিল দেখনি ?" দিদি চক্‌চকে চোখ করে বলল, "ওরাই রাত-পরী, লম্বা-নাক কুলো-কানের চেয়ে কিসে খারাপ শুনি ?"

উবিনের মায়ের ছেলে ওকে নিতে আসেনি বটে, কিন্তু টাকা পাঠিয়েছিল। উবিনের মা বলেছিল, "দেবেই তো, পরীরা ছাড়বে কেন ? দুধ-কমলা খেয়েছে না ?"

ঝুমঝুমি

হবি তো হ, পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে বুড়ো লোকটির সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়ে গেল। এর আগেও তাকে আমার জানলা থেকে লক্ষ্য করেছি, বিলবিলে চোখ, সরু লম্বা মাথা, খাড়া খাড়া চুল, মোটা কান, ছুঁচলো নাক, খুর খুর করে চলে, এলোপাথাড়ি পথ পার হয়। পায়ের জুতো খলবল করে, বগলে এক তাড়া রংচঙে কাগজপত্র, মুখে মুচকি হাসি।

গেছিল আরেকটু হলেই তিন চাকা গাড়ির তলায়। কোনোরকমে হিড়হিড় করে টেনে ফুটপাথে তুললাম। ঠিক হিড়হিড়ও নয়, সড়সড় করে চলে এল, মনে হয় একটা বড় টিকটিকির চেয়ে একটুও বেশি ওজন নয়। হাঁপাচ্ছিল বেজায়, মুখটা নীলমতো দেখাচ্ছিল। এক রকম আধ-কোলা করে দোতলায় আমার ঘরে এনে ফেললাম।

একটু জল বাতাস খেয়ে সুস্থ হয়ে লজ্জিতভাবে বলল, "বর্ষাকালে ওদের দেখতে পাওয়া যায় কিনা তাই, খুঁজতে খুঁজতে, অন্য দিকে খেয়াল থাকে না।"

"কাদের দেখতে পাওয়া যায়?"

ঠিক সেই সময় চারদিক অন্ধকার করে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামল। আমাদের ছাদে মোটা মোটা ধারায় জল পড়তে লাগল।

লোকটি বলল, "বলিনি, ঐ দেখ।"

দেখলাম জলের ধারা যেখানে এসে মাটিতে পড়ছে, সেইখানেই ফুরফুরে চারটি ডানা মেলে সাদা ঝলমলে পোশাক পরা, ছোট পরী নেচে উঠছে। তারপর স্রোতের সঙ্গে সাঁতরে চলে যাচ্ছে, মাথাটি শুধু দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, "ওকি, ওকি, নালা দিয়ে নেমে যাবে যে, অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।"

বুড়ো লোকটি বলল, "দূর দূর, তাই কখনো হয়? বৃষ্টি থামবে, বাতাস বইবে, রোদ উঠবে, তখন তাকিয়ে দেখো যেখানেই জল সেখান থেকেই কেমন সারি সারি উঠে এসে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।"



অবাক হয়ে বললাম, "আগে তো কখনো দেখিনি ওদের।"

বুড়ো চটে গেল। "দেখনি আবার কি! পুজোর পরে যেই উত্তরে

হাওয়া বয়, গাছপালা শিরশির সরসর করে পাতা ঝরায়, তখনো দেখনি বলতে চাও, হলুদ ঘাগরার ঝাপটা দিয়ে শুকনো পাতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ?"

অমনি মনে হল দেখেছি বটে। বুনো হাঁসরা যখন উত্তর থেকে উড়ে আসে, তাদের সঙ্গেও থাকে। মাঝিরা যখন রাতে দাঁড় বেয়ে নৌকো চালিয়ে যায়, পেছনে লম্বা আলোর পথ ফেলে রেখে যায়, সেই পথে খেলা করতে দেখেছি। পুকুর পাড়ে গুলঞ্চ গাছের গোটা গোটা ফুল যখন জলের ঝরে পড়ে আর তাদের ছায়াগুলো জল থেকে তাদের ধরবার জন্য লাফিয়ে ওঠে, সেখানেও যেন ওদের দেখেছি। আমাদের রাস্তায় যখন থেকে থেকে টুপ করে সব আলো একসঙ্গে নিবে যায়, তখন ছোট্ট পাখি হয়ে উড়তে দেখেছি। কালীপুজোর দিন ছোটবেলায় যখন ফুলঝুরি জ্বালাতাম, ফুলঝুরি থেকে আলোর ফুলকির সঙ্গে দফে দফে উড়ে যেতে দেখেছিলাম। শীতের দিনে পাহাড় দেশে চিমনির ধারে বসে যখন আগুন পোয়াতাম, আগুনের মধ্যে নাচতে দেখতাম, কাঠ নাড়লে আগুনের ফুলকি ছুঁড়ে মারত। বুড়োকে সে কথা বলতে যাব, দেখি সে তখন চলে গেছে। আমার জন্য রামধনু রঙের একটুকরো কাগজ রেখে গেছে। তাতে এই কথাগুলো লিখে পাঠালাম।

সুন্দরী

গুপি ভালো করে পথ বাৎলে দেয়নি। বেলা দশটায় পানু যখন ছোট্ট স্টেশনটাতে নামল, কোন্ দিক দিয়ে যাবে ভেবে পেল না। বড় একটা শিমুল গাছতলায় পুরনো এক গাছের গুঁড়িতে বসে দুজন লোক চা খাচ্ছিল। পানু তাদের গুপির দাদুর নাম বলতেই বুড়ো লোকটা দু হাতে গরম চায়ের ভাঁড় ধরে, চোখের তারা ঘুরিয়ে ডান দিকে দেখিয়ে বলল, "ওর সঙ্গে যাও। ও ঐদিকেই যাবে।"

সে দিকে তাকিয়ে পানুর চক্ষুস্থির। এই বড় একটা সবুজ রঙের

ড্রাগন-ফ্লাই, দুজোড়া পাতলা ডানা মেলে, মাটি থেকে দেড় মানুষ উঁচুতে একেবারে স্থির হয়ে আছে। তাহলে এরই সঙ্গে যেতে হবে। এ তো এদিকে নড়েচড়ে না। আজ পানু প্রথম লক্ষ্য করল ড্রাগন-ফ্লাইটার কাচের মতো পাতলা ডানায় মিহি জালি মতো কাটা রয়েছে। সকালের রোদে মাটির ওপরে ড্রাগন-ফ্লাইয়ের ছায়া পড়েছে, তাতে অবধি জালি দেখা যাচ্ছে। ওর গায়ে রোদ পড়ে সবুজ রঙের ছটা বেরুচ্ছে।

এরই সঙ্গে যেতে হবে তাহলে। কখন যাবে কে জানে। হঠাৎ ড্রাগন-ফ্লাই এক ঝলক আলোর মতো সেখান থেকে কুড়ি হাত দূরে সরে, আবার শূন্যে স্থির হয়ে ভেসে রইল। পানুও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে পৌঁছল। মনে হল ড্রাগন-ফ্লাই কিছু চিবুচ্ছে। আশ্চর্যের কথা যে এতদূর সরে এল, অথচ এতটুকু ডানা নাড়া দেখা গেল না।

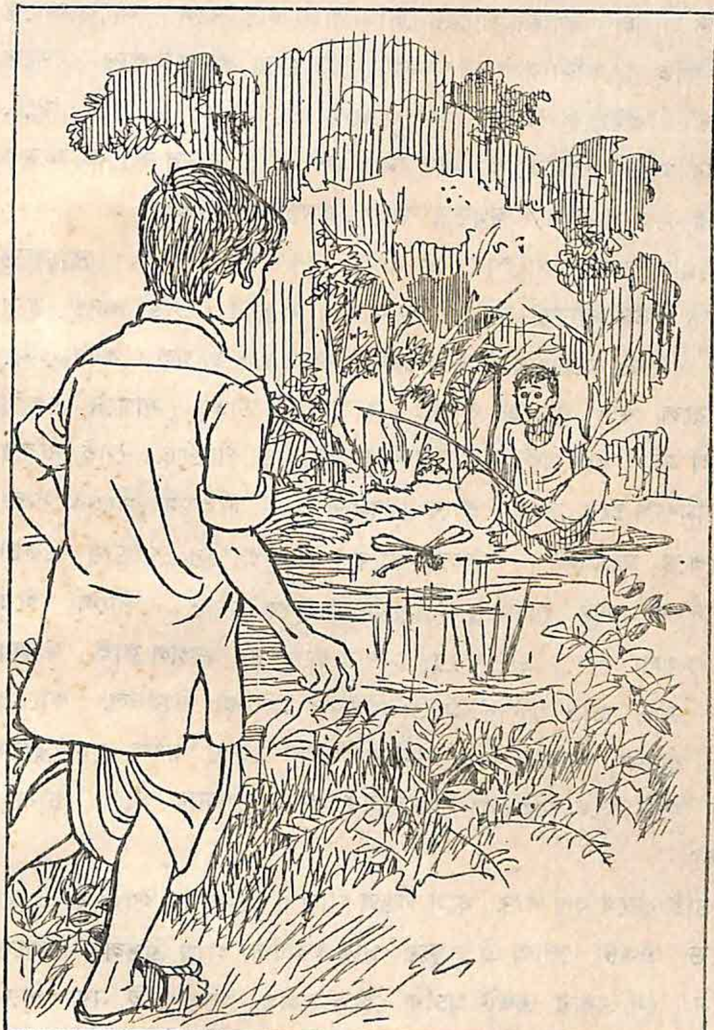
চিপ চিপ শব্দ করতে করতে একটা বুলবুলি পাখি কোথা থেকে ছোঁ মারল। ধরতে পারলেই হয়েছিল আর কি! পথপ্রদর্শকের দফা গয়া হলেই তো পানুরও হয়ে গেছিল! কিন্তু পারেনি ধরতে। ড্রাগন-ফ্লাই শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। অদৃশ্য হবে আবার কি! একি পরী নাকি? ভালো করে চেয়ে দেখে পানু বুনো রঙ্গন গাছের পাতা থেকে এক আঙুল ওপরে রয়েছে ড্রাগন-ফ্লাই আর দু হাতে এক বেচারা পাঁচ-কামড়াকে ধরে তাকে বিস্কুটের মতো কামড়ে খাচ্ছে। নাকি এর সঙ্গেই যেতে হবে। এর তো যাবার বিশেষ তাড়া দেখা যাচ্ছে না।

চোখ দুটো বেজায় বড়। মনে হল দুটো চোখ নয়, মাছির মতো দু গোছা চোখ। রোদ লেগে সমুদ্রের মতো নীল দেখাচ্ছিল। কি সরু কোমরটা, ছিঁড়েটিঁড়ে যাবে না তো? লম্বা সবুজ গাটাতে মিহি দাগ কাটা। পানুর মনে হল পরী না হলেও পরীর চেয়ে কিছু কম যায় না।

এক ঝলক বিদ্যুতের মতো বনের মধ্যে ঢুকে গেল ড্রাগন-ফ্লাই। কাঁটার খোঁচা লেগে ডানাটা ছ্যাঁদা হয়ে গেলেই তো হয়ে গেল

পানুর আজ গুপির দাদুর বাড়ি যাওয়া। ভালো পথপ্রদর্শক দিয়েছে ঐ লোকটি! বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল পানুর।

সামনে প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল। তাতে একটা বেশ বড় হলদে



প্রজাপতিও ঝুলছে। হয়তো এখনো মরেনি, একটু একটু নড়ছে মনে হল। জালের পাশে গাছের ডালের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে একটা সুপুরির মতো বড় মাকড়সা প্রজাপতির দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ জুল-

জুল করছে। ভ্যাগিস ড্রাগন-ফ্লাইটাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ড্রাগন-ফ্লাইও কি ওকে দেখতে পায়নি ?

চিড়িক করে সরে ড্রাগন-ফ্লাই মাকড়সার মাথার ওপর এসে শূন্যে ভাসতে লাগল। পান্নুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ড্রাগন-ফ্লাই মাকড়সার পিঠে নামল। তারপর কুট কুট করে দেখতে দেখতে মাকড়সার আটটা ঠ্যাং একে একে কেটে ফেলে দিয়ে, ঢোলের মতো শরীরটাকে মুখে নিয়ে শোঁ করে বনের আরো অনেক ভিতরে ঢুকে পড়ল। অগত্যা পান্নুও বনের মধ্যে ঢুকল।

অমনি সূর্যের আলোর রঙ বদলে সবুজ হয়ে গেল। রোদেতে ছায়াতে সোনালীতে সবুজে মিলে ড্রাগন-ফ্লাই প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বনের মধ্যে থেকে কত রকম শব্দ উঠতে লাগল। কটর-কটর, গুপি বলে ওটা ব্যাঙের ডাক। বাস্তবিকই তাই। সামনে একটা টলটলে জলে ভরা পুকুর। তাতে গাছের ছায়া পড়েছে। সেই জলের ওপর নিশ্চল হয়ে ভেসে আছে ড্রাগন-ফ্লাই। মাকড়সা খাওয়া সারা হয়ে গেছে মনে হল। জলের ধারে তেঁতুল গাছের গোড়ায় একটা ব্যাঙ সতৃষ্ণ নয়নে ড্রাগন-ফ্লাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। ভালো করে চেয়ে দেখল পান্নু; একেবারে নিশ্চয় হয়ে নেই ড্রাগল-ফ্লাই, জলের ওপর ছোট ছোট মশার মতো যে-সব পোকা উড়ছিল, কাচের মতো পাতলা ডানা আর পান্নার মতো সুন্দর সবুজ গা রোদে মেলে দিয়ে, খুদে খুদে পোকাগুলোকে ধরে মশলার মতো চিবিয়ে খাচ্ছে !

তাই দেখে ধপ করে বসে পড়ল পান্নু। শুকনো পাতার মতো দেখতে একটা লোক ঐ পুকুরে মাছ ধরছিল, পান্নু এতলণ দেখতে পায়নি। সে এবার একটু মুচকি হেসে বলল, "শুধু তাই নয়। শূন্যে বাস করে, ড্যাঙার জিনিস ধরে খায়, জলের গাছে ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চারা জলের মধ্যেকার সব পোকামাকড় কুচো চিংড়ির ছানা মায় আমার ছিপে বাঁধা টোপটা সুদ্ধু খাবার তালে থাকে। ঐ বুঝি তোমাকে নিতে এসেছে।"

শুনে আঁৎকে উঠেছিল পান্নু। ফিরে দেখে ড্রাগন-ফ্লাই নয়, গুপিদের চাকর গুটে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

ড্রাগন-ফ্লাইটা বোধ হয় জলের বড় বেশি কাছে নেমে এসেছিল। সড়াৎ করে ব্যাঙের জিব বেরিয়ে এল ; তার পরেই হতভম্ব হয়ে পান্নু দেখল ড্রাগন-ফ্লাইয়ের মাথাটা ব্যাঙের মুখের এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে, সবুজ রঙের ল্যাজের ডগাটা অন্য পাশ দিয়ে ঝুলছে। তারপর তাও দেখা গেল না।

পান্নু বলল, "স্টেশন-মাস্টার তো আচ্ছা লোকের সঙ্গে যেতে বলেছিল আমাকে!"

গুটে বলল, "তা বললে হবে কেন? তেন তো বলেছিল আমার সঙ্গে যেতে, তা তুমি তো বোঁ করে কোথায় পেলিয়ে গেলে! সেই ইস্তক খুঁজে বেড়াচ্ছি।"
